গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১২ -১৮ নভেম্বর, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

বারাক ওবামাকে লাল কার্পেট অভ্যর্থনা

জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যের প্রতি অপমান

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভাষণ বয়কট করল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

" বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে ভারত সরকার লাল কার্পেট অভ্যর্থনা জানাচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন দখলীকৃত ইরাক ও আফগানিস্তানের স্বাধীনতাকামী জনগণ মার্কিন সেনাদের দ্বারা অত্যাচারিত, পঙ্গু ও নিহত হচ্ছে। বন্দুক, কামান ও বোমার মুখে সেখানকার মহিলাদের শ্লীলতা হরণ করা হচ্ছে, তাঁরা ধর্ষিতা হচ্ছেন। প্যালেস্টাইন জনগণের উপর ইজরায়েলি জিওনিস্ট শাসকচক্র কর্তৃক সশস্ত্র আক্রমণকে প্রকাশ্যে ও নিয়মিতভাবে মদত দিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক হুমকি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে, তাদের হুকুম তামিল করতে যে দেশই নতশির হবে না, তাকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বরদাস্ত করবে না। দুনিয়ার বুকে যাবতীয় অনাচার-অবিচারের প্রতিমূর্তি হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবতা ও সার্বভৌমত্বের এরা পয়লা নম্বর শত্রু এবং সন্ত্রাসবাদের প্রধান মতদাতা। বিশ্বব্যাপী বর্তমান নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে আমেরিকার সম্পদের পাহাড়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিদিন নতুন নতুন যুদ্ধচক্রান্ত করে চলেছে, বিশ্বে সর্বত্র যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে চাইছে, কারণ যুদ্ধ ছাড়া সে টিকে থাকতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক কিউবা ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রাখা সহ নানা ষড়যন্ত্র তারা চালাচ্ছে, যার লক্ষ্য হল ওই সব দেশের সমাজব্যবস্থা ও সরকারকে পুরোপুরি ধ্বংস করা।

কেবলমাত্র ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ এবং ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যই মনমোহন সিং সরকার বারাক ওবামাকে এত জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এ কথাও পরিষ্কার যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার বুকে তার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায় ভারতকে বিশ্বস্ত শরিক বলে গণ্য করে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সরকারি সফর দিয়ে সেই শরিকি বন্ধনকে আরও দৃঢ় করাই তাদের লক্ষ্য। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সফরকে ঘিরে ভারত সরকারের সমস্ত কর্মকাণ্ডই অত্যন্ত অমর্যাদাকর, জনবিরোধী ও বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। ভারত সরকারের এই ভূমিকা ভারতীয় জনগণের সুদীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতিও অপমান।

এই জঘন্য ভূমিকার প্রতিবাদ করতেই হবে। ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে সেই প্রতিবাদ জানানোর জন্যই আগামী ৮ নভেম্বর সংসদের সভায় আমন্ত্রিত মার্কিন রাষ্ট্রপতির ভাষণ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাংসদ বয়কট করবেন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত আমরা লিখিতভাবে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে জানিয়ে দেব।

ভারতের স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে ৮ নভেম্বর এক কালা দিবস। ওই দিন দেশের সকল রাজ্যে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সংগঠিত করার জন্য আমাদের দল জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে।"

ওবামার ভারত সফরের বিরুদ্ধে কলকাতা সহ রাজ্যে রাজ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ

৮ নভেম্বর কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভ (অন্য রাজ্যের আরও ছবি ২ ও ৮-এর পাতায়)

৮ নভেম্বর দিল্লি ঃ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), কমিউনিস্ট গদর পার্টি অফ ইন্ডিয়া, দি জামাত-এ-ইসলামী হিন্দ, দি লোকরাজ সংগঠন, দি অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কার্স কাউন্সিল, সিপিডিএম, দিল্লি শ্রমিক সংগঠন এবং জনপক্ষ প্রভৃতি সংগঠনের উদ্যোগে সহস্রাধিক মানুষ মান্ডি হাউসে সমবেত হয়ে মিছিল করে পার্লামেন্টের দিকে যায়। যন্তরমন্তরে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করলে মিছিল এক জনসভায় পরিণত হয়। সমবেত প্রতিবাদী মানুষের সামনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল (ছবিতে মাঝে), পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী (ছবিতে বামদিকে), হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান, দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল, পাঞ্জাবের কমরেড অমিন্দর পাল সিং। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড প্রকাশ রাও (গদর পার্টি), ডঃ ভেঙ্কটেশ (লোকরাজ সংগঠন) প্রমুখ।

মাধ্যমিকে উর্দুতে প্রশ্নপত্রের দাবি জয়যুক্ত

৪ ডিসেম্বর বিজয় সমাবেশ

দীর্ঘ ১২ বছর লাগাতার আন্দোলনের পর অবশেষে জয়যুক্ত হল উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিকে উর্দুতে প্রশ্নপত্রের দাবি। ২৫ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে ঘোষণা করেছেন, এবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র উর্দু ভাষাতেও দেওয়া হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কথা সিপিএম সরকার মুখে বললেও এতদিন উর্দুতে প্রশ্নপত্র দেওয়া হত না। স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষায় উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যা হত। মাধ্যমিক ও হাই মাদ্রাসায় উর্দু মাধ্যম ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নপত্র উর্দুতে দেওয়ার দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের এ এল টি হলে এক শিক্ষা কনভেনশনের মধ্য দিয়ে 'স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি' গড়ে ওঠে। কমিটির ডাকে স্কুলে স্কুলে কনভেনশন করে স্কুল কমিটি গঠিত হয়। এলাকাতেও কমিটি গড়ে ওঠে। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষাবিদরা এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যুক্ত হন। আন্দোলনে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ধমান, পুরুলিয়া, উঃ চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় ছাত্ররা ব্যাপকভাবে কমিটির আন্দোলনে যুক্ত হয়। রাজ্য জুড়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

খরা প্রতিরোধের দাবিতে হুড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ

সরকারিভাবে পুরুলিয়া জেলা খরাপীড়িত ঘোষিত হলেও এখনও পর্যন্ত প্রশাসন ন্যূনতম কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়নি। খরা প্রতিরোধ কমিটি, হুড়া থানা শাখার নেতৃত্বে ব্লক অফিসে বারবার ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা সত্ত্বেও প্রশাসনের টনক না নড়ায় ২৭ অক্টোবর ৬০ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। সমস্ত জবকার্ড হোল্ডারদের বছরে অন্তত ২০০ দিনের কাজ, দৈনিক ১৫০ টাকা মজুরি, পানীয় জল সহ প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ, খরামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত চাষি ও খেতমজুর পরিবারের প্রত্যেককে মাসে ২ টাকা দরে ১০ কিগ্রা খাদ্যশস্য সরবরাহ, গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খোলা, কৃষকদের একর প্রতি ১২০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও কাজের বিনিময়ে খাদ্যের দাবিতে অবরোধে বক্তব্য রাখেন সীতারাম মাহাত, অলোক বসু, বিনোদবিহারী মণ্ডল প্রমুখ। শতাধিক গরিব কৃষক ও খেতমজুর মিছিল ও পথ অবরোধে অংশগ্রহণ করেন।

কাটোয়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

বিদ্যুতের ব্যাপক মাশুল বৃদ্ধি, লোডশেডিং ও অ্যাডিশনাল সিকিউরিটির বিরুদ্ধে কাটোয়ার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ১-৬ অক্টোবর বিল কয়কট আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যক গ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনকে সুসংগঠিত রূপ দিতে ৩১ অক্টোবর রবীন্দ্র ভবনে গ্রাহকদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্কশপ করা ও গ্রামে গ্রামে সংগঠনের শাখা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ১২০০ সদস্য সংগৃহীত হয়েছে। সম্মেলনে সমস্ত স্তরের গ্রাহক প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আক্রমণের নানা দিক উল্লেখ করে আন্দোলন শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস। প্রাক্তন শিক্ষক মৃগাঙ্কমৌলি দত্তকে সভাপতি এবং মহীতোষ কর্মকার ও আবুল হাসনাদকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪১ জনের অ্যাবেকা কাটোয়া শাখা কমিটি গঠিত হয়।

মাধ্যমিকে উর্দুতে প্রশ্নপত্রের দাবি জয়যুক্ত

একের পাতার পর

দুর্বার আন্দোলনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বিশাল ছাত্রবিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। '০২ সালে ছাত্রছাত্রীরা ১০ হাজার পোস্টকার্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে তাদের দাবি জানায়। কিন্তু সিপিএম সরকার এই দাবিতে কর্ণপাত করেনি। কমিটি '০৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবসে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। রাজ্যের সমস্ত উর্দুভাষী স্কুল স্তব্ধ হয়ে যায়। ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তা অবরোধ, রেল অবরোধ শুরু করে। তাতেও সরকার সাড়া না দিলে '০৪ সালের ২১ জুলাই সমস্ত ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। তাতে বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল প্রমুখ বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি গৃহীত হয়। এর পর কমিটির সভাপতি আয়সানুল হক, কবি তরুণ সান্যাল, উর্দু কবি ডঃ সাব্বির আবরাবি সহ পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের কাছে দাবিসনদ পেশ করে। '০৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর উর্দু অ্যাকাডেমির সামনে ছাত্রবিক্ষোভ সংগঠিত হয়। '০৫ সালে মাধ্যমিক বোর্ড প্রেসিডেন্টের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পর্ষদের সভাপতি হরপ্রসাদ সমাদ্দার বলেন, একাধিক ভাষায় প্রশ্নপত্র দিলে তার গোপনীয়তা থাকবে না, প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাবে। এই মন্তব্য রাজ্য জুড়ে ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে '০৬ সালে মাধ্যমিক বোর্ড অফিসে ডেপুটেশন দিতে গেলে তৎকালীন সভাপতি ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামী মেজাজ লক্ষ্য করে জানান, উর্দু-হিন্দিতে প্রশ্নপত্র দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু এ কথা ঘোষণা করলেও তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। ফলে আন্দোলন তীব্র করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। '০৭ সালে ১৯ আগস্ট কলকাতা জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করে। এই আন্দোলন চলাকালীন বি এডের জন্য ১০০ নম্বরের উর্দু মেথড পেপার চালু এবং কয়েকটি উর্দুমাধ্যম উচ্চমাধ্যমিক স্কুল খোলা সহ অন্যান্য কিছু দাবি আদায় হয়। এই জয়ে উৎসাহিত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নপত্রের আন্দোলন তীব্রতর করে। শাসক দল সিপিএম আন্দোলন ভাঙতে তৎপর হয়। কোনও ছাত্র যাতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে সে জন্য তারা স্কুলে স্কুলে হুইপ জারি করে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা সব বাধা উপেক্ষা করে '০৯ সালে পর্ষদ ঘেরাও অভিযানে ব্যাপকভাবে যোগ দেয়। আন্দোলনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লক্ষ করে বোর্ড সচিব পার্থ রায় জানান, পরীক্ষামূলকভাবে ইতিহাস ও জীবনবিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র উর্দুতে দেওয়া হবে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত বিষয়ে উর্দুতে প্রশ্নপত্রের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের চাপের কাছে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং এ বছর উর্দুতে সমস্ত বিষয়েই প্রশ্নপত্রের দাবি মেনে নেয়।

কমিটির সম্পাদক ইমতিয়াজ আলম উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই ঐতিহাসিক জয় দীর্ঘ আন্দোলনের ফল। এই জয় থেকে শিক্ষা নিয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং কলেজগুলিতে উর্দু বিভাগ খোলা, উর্দু জানা শিক্ষক নিয়োগ, উর্দু টেক্সট বই প্রকাশ প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি ৪ ডিসেম্বর কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার থেকে বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান। স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটির আন্দোলনের এই জয়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই।

প্রবীণ কৃষক সংগঠকের জীবনাবসান

অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর-১ ব্লক কমিটির সভাপতি, প্রাথমিক শিক্ষক কমরেড রবীন্দ্রনাথ মাহাতো ৯ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। কমরেড মাহাতো প্রৌঢ় বয়সে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। 'মার্কসবাদকে জীবন দর্শন হিসাবে গ্রহণ করে সেই আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করতে হবে', মহান নেতার এই কথাটি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনি বয়সের ভার উপেক্ষা করে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। তাঁদের বিপদে প্রয়োজনে ব্লকের বিভিন্ন স্থানে তিনি ছুটে যেতেন। এই জনমুখী সমাজসেবী ভূমিকাই তাঁকে সাধারণ মানুষের আস্থাভাজন করে তুলেছিল। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের নানা ন্যায্য দাবি, শিক্ষার দাবি নিয়ে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। ব্লকের সর্বত্র সংগঠনের বিস্তার ঘটানোর জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন।

তাঁর স্মরণে ৩ অক্টোবর গোপীবল্লভপুরের বাসিন্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু মানুষের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্মৃতিচারণ করেন স্থানীয় শিক্ষক কালীকিঙ্কর প্রধান, শিক্ষক বেঞ্জামিন মাহাত, নীহার পাল, সুশান্ত সৎপথী। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য, কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড নিত্যানন্দ পাতর।

কমরেড রবীন্দ্রনাথ মাহাতো লাল সেলাম।

হাওড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে

সেপ্টেম্বর মাস থেকে বিদ্যুতের অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি বাতিল, বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে অ্যাবেকার নেতৃত্বে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার বিভিন্ন থানায় ব্যাপক প্রচার অভিযান, গ্রাহকসভা ও সদস্য সংগ্রহ অভিযান এবং বিদ্যুৎ অফিসে বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত হচ্ছে।

১ অক্টোবর উলুবেড়িয়া স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে প্রায় এক হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ দেখান এবং আট শতাধিক গ্রাহকের অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। এই আন্দোলনে উলুবেড়িয়া শহর সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং উলুবেড়িয়া বাজার পাড়ায় সদস্য সংগ্রহ চলতে থাকে। সহস্রাধিক গ্রাহক সদস্য হন। ১০ অক্টোবর ব্যাপক গ্রাহকদের উপস্থিতিতে থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। সম্মেলন থেকে হীরালাল গায়েনকে সভাপতি, দীনবন্ধু মণ্ডলকে সহ সভাপতি, বলরাম মান্নাকে সম্পাদক ও সুখেন মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৪২ জনের গ্রাহক সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে।

কুলগাছিয়া বীরশিবপুরে প্রায় পাঁচশ গ্রাহক অ্যাবেকার সদস্য হন। ২৪ অক্টোবর কুলগাছিয়ায় তিন শতাধিক গ্রাহকের উপস্থিতিতে স্থানীয় সম্মেলন হয়। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র, জেলা সংগঠক তাপস দাস ও মিনতি সরকার। প্রীতিরঞ্জন বসুকে সভাপতি ও আর দণ্ডপাঠকে সম্পাদক করে কুলগাছিয়া-বীরশিবপুর শাখা কমিটি গঠিত হয়। ২ নভেম্বর কমিটির উদ্যোগে বীরশিবপুর স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন সংগঠিত হয়।

২৪ অক্টোবর আমতা শহরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার রাজ্য কমিটির সদস্য অসিত দাস দাস ও জেলা সংগঠক প্রদীপ মণ্ডল। শ্যামপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে অক্টোবর মাস জুড়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান চলেছে। এই থানার দুটি কল সেন্টারে বিল বয়কটে গ্রাহকরা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছেন।

৮ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার ভারত সফরের প্রতিবাদে কলকাতায় ওবামার কুশপুতুলে আগুন দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ও নিচে বিহারের পাটনায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত

সাক্ষ্য, প্রমাণ, ঐতিহাসিক নথি— সব কিছুই অগ্রাহ্য করে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের তিন সদস্যের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ ৩০ সেপ্টেম্বর যে রায় দিয়েছে, তা সত্যিই নজিরবিহীন এবং এক অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রবণতা।

অপূর্ব স্থাপত্যকীর্তি নিয়ে বাবরি মসজিদ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৪৬০ বছর ধরে। বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বিজেপির নেতৃত্বে সেটা ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই স্থানটিকে তিনভাগে ভাগ করে তার দু-ভাগ রামজন্মভূমি হিসাবে হিন্দুত্ববাদীদের জন্য ও একভাগ মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট করে রায় দিয়েছে আদালত। বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বিজেপি দাবি তুলেছে, মুসলিমরা যেন তাদের ওই একভাগ এলাকাও রামমন্দির নির্মাণের জন্য ছেড়ে দেয়।

রামায়ণ ও রাম নিয়ে গবেষণার ফল

মহাকাব্যের চরিত্রকে বিচারকরা বানিয়েছেন রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্র, ইতিহাসের চরিত্র। অথচ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকরা বলছেন, রামচন্দ্র ইতিহাসের চরিত্র নয়, পৌরাণিক কাহিনীর নায়ক। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান/ অযোধ্যার চেয়ে সেই সত্য জেনো'। রামায়ণ সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফলও তাই। ভাষাবিদ ও ভারততত্ত্ববিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'তিনটি গল্প মিলিয়ে রামায়ণের গল্প তৈরি। এতে একবিন্দুও ঐতিহাসিকতা নেই' (সিলেক্ট ওয়ার্কস ভল্যুম ৩, পৃ-৪৭)। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর রামায়ণ সম্পর্কিত গবেষণায় দেখিয়েছেন, বাল্মীকির রামায়ণ রচনার পূর্বে দেশে-বিদেশে অনেক 'রামকথা' রচিত হয়েছিল। সেগুলিতেও দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত প্রভৃতি চরিত্র ও তাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই রামকথাগুলির মধ্যে বৌদ্ধসাহিত্য 'জাতকের কাহিনী'তে প্রাপ্ত তিনটি গল্প, জৈন সাহিত্যের একটি গল্প ও ইরানীয় খোটানি ভাষায় রচিত একটি গল্প উল্লেখযোগ্য। এই গল্পগুলির থেকেই বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। *(সূত্র ঃ রামকথার প্রাক-ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন)*। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন— ঋকবেদে একজন রামের উল্লেখ আছে, যিনি অসুর (দ্রঃ পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া)। বৌদ্ধ জাতককাহিনীতে রাম ও দশরথ বারাণসীর রাজা, অযোধ্যার নয়। সীতার সঙ্গে জনকের কোনও সম্পর্ক নেই। সেখানে সীতা রামের বোন। রোমিলা থাপার সহ বহু প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকই বলেছেন, রামায়ণ কাহিনী নানা সময়ে রচিত। জৈন ও দাক্ষিণাত্যের রামায়ণে রামের নয়, রাবণের প্রাধান্য দেখা যায়। রাম ঐতিহাসিক চরিত্র হলে রামায়ণ রচনার একটা নির্দিষ্ট সময় ও কাহিনীর একটা অভিন্ন কাঠামো থাকত। তাতে পরবর্তী অনেক রদবদল হতে পারত। কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর বিপুল বৈচিত্র্য ও রচনাকালের বিভিন্নতা প্রমাণ করে রাম চরিত্র ঐতিহাসিক নয়। অবশ্য হিন্দুত্ববাদী মানসিকতার ঐতিহাসিকরাও আছেন, যাঁরা রামকে ঐতিহাসিক চরিত্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, যদিও পারেননি। মন্দির-মসজিদ বিতর্ক খুঁচিয়ে তুলে সৃষ্টি করা সাম্প্রদায়িক পরিবেশে সংঘ পরিবার এ ধরনের ঐতিহাসিকদের সামনে নিয়ে আসে। আদালতের রায়েও সংঘ পরিবারের সেই পরিকল্পনারই প্রভাব দেখা গেল।

ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যদি আদালত রায় দেয়, তবে তো বিচারপতিদের এতকাল ধরে এত পরিশ্রম করে আট হাজার পাতা রায় লেখার দরকার ছিল না। রসায়ন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেখিয়েছেন, হিন্দুর জাতিভেদ ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। যুক্তি-প্রমাণকে নস্যাৎ করে ইউরোপের ক্যাথলিক গির্জার কর্তারা একদিন গ্যালিলিও-র প্রমাণিত সত্যকে খারিজ করে দিয়ে ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল; জোর গলায় ভ্রান্ত ধারণাটিকেই ঘোষণা করেছিল যে, পৃথিবী স্থির, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। শুধু তাই নয়, তাঁর আবিষ্কার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়েছিল বলে গ্যালিলিওকে তারা কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল এবং তিলে তিলে মৃত্যুর গহ্বরে তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল। তারও আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস আবিষ্কৃত এই সত্য প্রচার করেছিলেন জিয়োর্দানো ব্রুনো; তাই তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ঘটাতে হিটলার 'জার্মানদের রক্ত বিশুদ্ধ আর্য রক্ত' বলে স্লোগান তুলেছিল যা বিজ্ঞানে পরীক্ষিত সত্য ও ইতিহাসের বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিরোধী। সে সব ছিল অন্ধ বর্বরতার নজির। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা এ কী প্রত্যক্ষ করছি!

১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের মতো একটি ঐতিহাসিক সৌধকে যারা ধ্বংস করল, আদালত সেই ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলল না, উপরন্তু তাদের হাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার অধিকার তুলে দেওয়ার রায় দিচ্ছে! অথচ এই বর্বর ধ্বংসকাণ্ডকে সেদিনই সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, 'সমগ্র জাতির পক্ষে লজ্জাজনক কাজ'।

তুলসীদাসের রামায়ণেও অযোধ্যায় মন্দির ধ্বংসের উল্লেখ নেই কেন

রামভক্ত তুলসীদাস গোস্বামী হিন্দি রামায়ণ 'রামচরিতমানস' লিখে উত্তর ভারতে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে রামচন্দ্রকে জনপ্রিয় করেছেন। ১৫২৮ সালে যখন রামমন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ স্থাপন করা হয় বলে প্রচার করা হচ্ছে, তখন তুলসীদাসের বয়স ৩০ বছরেরও বেশি। এর মাত্র ৪৪ বছর পরে ১৫৭২ সালে তিনি রামায়ণ লেখা শেষ করেন। দেশে ম্লেচ্ছদের উত্থান অর্থাৎ মুসলিম রাজশক্তির প্রভাব বাড়ছে বলে তিনি এই রামায়ণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রামমন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ নির্মাণের মতো মারাত্মক ঘটনা ঘটে থাকলে, মাত্র ৪৪ বছর আগে তাঁরই জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া ম্লেচ্ছদের এমন টাটকা অনাচার প্রসঙ্গে তাঁর রামায়ণে উল্লেখ থাকত। তা কিন্তু নেই। অযোধ্যাতে কোনও কালে রামমন্দির ছিল বলে এতটুকু উল্লেখ পর্যন্ত নেই এই রামায়ণে, সেই সময় পর্যন্ত কোনও হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও তা ছিল না।

হিন্দুধর্মের যিনি পুনরুত্থান ঘটাতে চেয়েছিলেন, সেই বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম নিয়ে আমেরিকার ধর্মমহাসম্মেলনে বক্তৃতা করলেন, মুঘল সম্রাট আকবরের সৌন্দর্যপ্রীতির ভূয়সী প্রশংসা করলেন, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির হিন্দুরা নির্মাণ করেছে বৌদ্ধদের মঠ ভেঙে — এ কথাও বললেন। অথচ রামমন্দির ভেঙে মসজিদ হয়েছে এমন কথা কোথাও বললেন না। তাহলে যাঁরা বলছেন, যাঁরা প্রশ্রয় দিচ্ছেন, এবং যাঁরা এই বলাটা আইনসিদ্ধ করতে চাইছেন, তাঁরা ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামিতে মানুষকে আচ্ছন্ন করে ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ ও হানাহানির ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন, এ কথা বলা কি অন্যায় হবে!

বাবরের আত্মজীবনীতেও মন্দির ধ্বংসের কথা নেই

যাঁর নামে বাবরি মসজিদ, সেই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক বাবর যদি সত্যি সত্যি রামমন্দির ধ্বংস করে মসজিদ গড়েন, তবে সেটা তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'বাবরনামা'তে লিখে রাখতেন। যেমন, গোয়ালিয়রের কাছে উবরা উপত্যকায় নগ্ন জৈন মূর্তিগুলি অশ্লীল বলে তিনি সেগুলি ধ্বংসের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা তিনি আত্মজীবনীতে পরিষ্কারভাবে লিখে রেখে গেছেন। তাহলে রামের জন্মস্থান-মন্দির ধ্বংস করলে সেটা লিখতে তাঁর আটকালো কোথায়! মুঘল সম্রাট বাবরের তো কাউকে ভয় পাওয়ার ছিল না। আত্মজীবনীতেই প্রমাণ, স্থাপত্য শিল্পের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাবর। যেখানে যেতেন সঙ্গে নিতেন স্থপতিদের। নতুন স্থাপত্য দেখলেই নকশা আঁকিয়ে রাখতেন। দেখা যাচ্ছে, বাবর এক চিঠিতে পুত্র হুমায়ুনকে পরামর্শ দিয়েছেন, 'হিন্দুস্তানের জনগণের মন জয় করার জন্য গো-হত্যা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোরো। অন্যান্য ধর্মের মন্দির বা উপাসনালয়গুলিকে অপবিত্র কোরো না। শিয়া-সুন্নির ভেদাভেদ কোরো না, ওটি ইসলামের দুর্বলতা। তরবারির জোরে নয়, দয়ার দ্বারা ইসলামের প্রচার কোরো' *(দ্য সেক্যুলার এম্পায়ার বাবর, সুরিন্দর কাউর ও তপন সান্যাল)*।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননেও মসজিদের স্থলে মন্দির থাকার প্রমাণ মেলেনি

প্রত্নতত্ত্ববিদ বি বি লাল-এর নেতৃত্বে ১৯৭৫-৭৬ সালে আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (এ এস আই) পক্ষে বাবরি মসজিদের পেছনের অংশে ব্যাপক খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়। তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 'ইন্ডিয়ান আরকিওলজি — এ রিভিউ'-এর ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৮৯-৯০ সংখ্যায়। তাতেও বাবরি মসজিদের স্থলে আগে মন্দির থাকার কোনও কথা নেই। বরং দেখা গেছে, খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের আগে অযোধ্যায় দশরথের রাজপ্রাসাদ তো দূরের কথা, সেখানে আদৌ কোনও জনবসতিও গড়ে ওঠেনি।

এ প্রসঙ্গে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক ডি এন ঝা-র সাম্প্রতিক একটি ইন্টারভিউয়ের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, ''খননকার্যে আমি অংশগ্রহণ করিনি। যে ঐতিহাসিকরা (মসজিদ ধ্বংসের আগে) তথ্য-প্রমাণগুলি বিচার-বিবেচনা করতেন, তাঁদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা অনুভব করেছিলাম যে, এটা এমন একটা বিষয় যাতে সমগ্র জাতি উদ্বিগ্ন। এবং আমাদের চারজন — সুরজ ভান, অথার আলি, আর এস শর্মা ও আমি স্বাধীন ঐতিহাসিক হিসাবে এই মিটিংগুলোয় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তার ভিত্তিতে আমরা আমাদের রিপোর্ট লিখে ভারত সরকারের কাছে জমা দিয়েছি। তারপর প্রকাশ করেছি 'রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ : অ্যা হিস্টোরিয়ানস রিপোর্ট টু নেশন'। এই আলোচনার সময় আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আমাদের সঙ্গে শঠতাপূর্ণ আচরণ করেছে, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো, এমনকী ১৯৭৫-৮০-র রামায়ণ প্রকল্পের অযোধ্যা খননকার্যের 'সাইট নোটবুক' পর্যন্ত আটকে রেখেছে। আমরা তথ্য ও প্রমাণগুলো চেয়ে বহুবার চিঠি লিখেছি সরকারের কাছে। কোনওটাই মানা হয়নি। অযোধ্যা ইস্যুতে এ এস আই দোদুল্যমান। এটা সরকারের একটা বিভাগ হওয়ায় সরকারের নির্দেশে চলে, তাদের স্বাধীনতা নেই। হিন্দু মৌলবাদীদের সঙ্গে রয়েছে এই সংস্থার যোগসাজশ''।

বলেছেন, ''... এ এস আই-এর যে বক্তব্য তা আদৌ সিদ্ধান্ত নয়। ২০০৩-এর খনন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল যে, মসজিদের তলায় একটি বিশাল কাঠামো দেখা গেছে এবং এটা পিলারের উপর স্থাপিত ছিল। আরও বলা হয়েছে, পিলারের গোড়ায় ইটের টুকরো দেখা গেছে। কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক যাঁরা খননকার্য প্রত্যক্ষ করছিলেন, আদালতে তাঁদের অভিযোগ, ছড়িয়ে থাকা ইটের টুকরোগুলো একসঙ্গে জড়ো করে রাখা হয়েছিল, যা পিলারের ভিত্তির মতো দেখতে। মজার ব্যাপার, ২০০৩-এর রিপোর্টের মেইন টেক্সট-এর অধ্যায়গুলিতে লেখকদের নাম আছে, কিন্তু 'সামারি অফ রেজাল্টস' বলে যে সিদ্ধান্তের অধ্যায় সেখানে লেখকের নামের কোনও উল্লেখ নেই।

''সর্বোপরি রিপোর্টের মেইন টেক্সট-এ কোনও মন্দিরের উল্লেখ নেই। কিন্তু হঠাৎ লেখকের নামহীন 'সামারি অফ রেজাল্টস'-এ মন্দির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হয়েছে। এই রিপোর্ট স্পষ্টতই একটি জোড়াতালি দেওয়া দলিল'' (ফ্রন্টলাইন, ৯-২২ অক্টোবর, ২০১০)। এই প্রসঙ্গে আবারও স্মরণ করতে হবে জার্মানির ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের প্রক্রিয়ায় হিটলারের নির্দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী পুড়িয়ে নতুন করে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে বইপত্র লেখানো হয়েছিল। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যকে বিকৃত করা হয়েছিল।

মধ্যযুগের মতো মন্দির-মসজিদ ভাঙার খেলা সভ্য সমাজে চলে না

দেখা গেল, মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার যে প্রচার, তার পেছনে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক কোনও প্রমাণ নেই, কিংবা এর পেছনে কোনও যুক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ১৫২৮ সালে সত্যিই মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়া হয়েছিল, তবুও এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজ সেই মসজিদ ভেঙে মন্দির গড়ার পরিকল্পনা কখনওই সমর্থনযোগ্য হতে পারে কি? কেননা, সমগ্র দুনিয়ায় মধ্যযুগ ছিল মঠ-মন্দির-মসজিদ ভাঙার ইতিহাসে ভরা। আমাদের এদেশেই খোদ অযোধ্যায় একশত বৌদ্ধ মঠ ছিল, হিন্দু মন্দির ছিল মাত্র দশটি। আজ সেখানে সমস্ত বৌদ্ধ মঠের জায়গায় হিন্দু মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। বিহার রাজ্যটির নামকরণই হয়েছে এখানে প্রচুর বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল বলে। সমস্ত বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করে হিন্দু মন্দির তৈরি হয়ে গেছে। গৌড়ের হিন্দু রাজা শশাংক বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করেছিলেন, এমনকী বুদ্ধদেব যে বৃক্ষের তলায় বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সেই অত্যন্ত পবিত্র 'বোধিবৃক্ষ'ও তিনি কেটে ধ্বংস করেছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির আগে ছিল বৌদ্ধদের মঠ; হিন্দুরা সেই মঠকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করেছে। কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হর্ষ 'দেবোৎপাটক' নামে কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। উদ্দেশ্য মন্দির লুঠ। আবার মুসলমান রাজার আক্রমণেও বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস হয়ে মসজিদে পরিণত হয়েছে। এ সবই ঘটেছে সেই ধ্বংসমুখর মধ্যযুগে। আজ যদি বৌদ্ধরা দাবি করে যে, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তাদের মঠ ফিরিয়ে দিতে হবে, আর হিন্দুরা বলে যে, মসজিদ ভেঙে সব মন্দির বানাবো, তবে মধ্যযুগের সঙ্গে এই আধুনিক সুসভ্য যুগের পার্থক্য থাকে কোথায়? তাহলে আর সব কাজ শিকেয় তুলে রেখে কেবল এই ভাঙাভাঙিই চালাতে হয়। এ জিনিস কোনও সভ্য সমাজের দাবি হতে পারে না। ১৫২৮ সালে যদি রামমন্দির ভেঙে সত্য সত্যই মসজিদ গড়া হত, তাহলেও আজ সেই মসজিদ ভেঙে মন্দির গড়ার কর্মটি একটি জঘন্যতম অপকর্মই হত।

দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও সাচার কমিটি রিপোর্টের লেখক জাস্টিস রাজিন্দর সাচার আইনি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে যুক্তির উপর ভর করে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি আদালতে গিয়েছে ও ভূমির দাবি করছে, আইনের বিচারে তা আদৌ ধোপে টেঁকে না। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, মসজিদটি স্থাপিত হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে, প্রায় ৫০০ বছর আগে। মামলা দায়ের করা হয়েছে সবেমাত্র। লিমিটেশন অ্যাক্ট বলছে, বিবাদের তারিখের থেকে ১২ বছরের মধ্যে মামলা করা যায়। তাহলে ওখানে মন্দির ভেঙে যদি মসজিদ গড়া হয়েও থাকে, তাহলেও এ নিয়ে মামলা করবার আইনি অধিকার পর্যন্ত আজ আর কারও থাকে না। কারণ, মসজিদটি লিমিটেশন পিরিয়ডের আগে থেকেই খাড়া আছে।

বিচারপতি সাচার এ সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন। বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরে

চারের পাতায় দেখুন

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়

তিনের পাতার পর

শহিদগঞ্জ নামে একটি মসজিদ ছিল ১৭২২ সাল থেকে। কিন্তু ১৭৬২ সালে ওটি মহারাজা রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখদের শাসনাধীনে আসে এবং সেটি শিখদের গুরুদ্বার হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ৭৩ বছর পর ১৯৩৫ সালে আদালতে একটি মামলা ওঠে যে, এটি আদতে একটি মসজিদ ছিল, সে কারণে তা মুসলিমদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রিভি কাউন্সিল তার রায়ে বলে যে, সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি থাকলেও এখন আর তা সম্ভব নয়, কারণ, ১২ বছরের যে লিমিটেশন পিরিয়ড তার অনেক আগে থেকেই এটি গুরুদ্বার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি এখন নিঃসন্দেহে একটি গুরুদ্বার। তাই এটি ধ্বংসের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। *(সূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ৯-২২ অক্টোবর '১০)।*

স্বাধীন ভারতে এক চরম জালিয়াতির দিন ২২-২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৯

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারকরা ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর জোর দিয়ে বলেছেন, যেখানে মূর্তিগুলো বসানো আছে, সেটাই রামের জন্মস্থান। কিন্তু ওই মূর্তিগুলো কী করে ওখানে এল, কোন পথে? এ প্রসঙ্গে মৌলবাদী হিন্দু সংগঠনের মুখপত্র 'অর্গানাইজার' পরবর্তীকালে লিখেছিল ঃ '১৯৪৯-এর ২৩ ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক সকালে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মূর্তি জন্মস্থানে অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হল। এই অলৌকিক ঘটনায় হিন্দু ভক্তরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং তারা হাজারে হাজারে সেখানে এসে জড়ো হল।' এর পরই সরকার এলাকাটিকে বিতর্কিত ঘোষণা করে গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

প্রকৃত সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সত্য রেকর্ড করা আছে দুটি অকাট্য ও তর্কাতীত ডকুমেন্টে — একটি রেডিওবার্তা এবং অন্যটি অযোধ্যা থানার এফ আই আর। ১৯৪৯-এর ২৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় জেলাশাসক কে কে নায়ার রেডিওবার্তাটি পাঠিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে। তাতে আছে ঃ ''রাতে যখন মসজিদে কেউ ছিল না, তখন কিছু হিন্দু বাবরি মসজিদে প্রবেশ করে এবং সেখানে একটি দেবতার মূর্তি স্থাপন করে। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে রয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। ১৫ জনের পুলিশ পিকেট রাতের ডিউটিতে ছিল, কিন্তু তারা কার্যত কিছুই করেনি।'' এ কাজ যারা করেছিল বৃহত্তর হিন্দু সমাজের তারা কেউ নয়। তারা হিন্দুত্ববাদী।

অযোধ্যা থানায় পুলিশ কনস্টেবল মাট্টাপ্রসাদের পেশ করা রিপোর্ট নিয়ে অযোধ্যা থানার সাব-ইন্সপেক্টর রাম দুবে একটি এফ আই আর দায়ের করেন। মাট্টাপ্রসাদের বিবরণ অনুযায়ী, 'যখন আমি সকাল ৮টা নাগাদ জন্মভূমিতে পৌঁছলাম, আমি জানলাম যে, ৫০-৬০ জনের একটি দল মসজিদে ঢোকার কম্পাউন্ড গেটের তালা ভেঙে বা সিঁড়ির সাহায্যে কম্পাউন্ডের দেওয়াল টপকে বাবরি মসজিদে প্রবেশ করে এবং ভিতরে শ্রীভগবানের একটি মূর্তি স্থাপন করে। বাইরে ও ভিতরের দেওয়ালে গেরু দিয়ে রাম সীতা এঁকে দেয়। ডিউটিতে থাকা হংসরাজ তাদের সরে যেতে বললেও তারা শোনেনি। কাছাকাছি থাকা প্রাদেশিক সশস্ত্রবাহিনী এসে নিয়ন্ত্রণ করবার আগেই লোকগুলো মসজিদে ঢুকে পড়ে। জেলা প্রশাসনের অফিসারেরা ঘটনাস্থলে আসেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নিজেরা উদ্যোগী হন। তারপর ৫-৬ হাজার মানুষের একটা জমায়েত চারদিকে জড়ো হয়ে যায় এবং তারা ভজন গাইতে গাইতে ও ধর্মীয় শ্লোগান দিতে দিতে মসজিদে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের আটকে দেওয়া হয়। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে অবাঞ্ছিত আর কিছুই ঘটেনি। রাম দাস, রামশক্তি দাস ও অন্য ৫০-৬০ জন অচেনা লোক চুপিসারে মসজিদে ঢুকেছিল এবং এর পবিত্রতা নষ্ট করেছিল। ডিউটিরত সরকারি কর্মচারীরা এবং আরও অনেকে তার সাক্ষী। সেই জন্য এটা লিখে নথিভুক্ত করা হল।'

ঘটনার আগে ৯ দিন ধরে ঘটনাস্থলে অখণ্ড রামচরিতমানস পাঠ চলছিল। পাঠ শেষ হওয়ার আগের রাতে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই এই ঘটনাটি ঘটিয়ে সকালে রটিয়ে দেওয়া হয় যে, রামলালা নিজেই তাঁর জন্মস্থানে আবির্ভূত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই প্রথাগতভাবে দীর্ঘসূত্রী যে আদালত, সেই আদালত অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে উঠে এবং ৬ দিনের মধ্যেই ২৯ ডিসেম্বর মসজিদের দখল মুসলিম সম্প্রদায়কে ফিরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে শান্তিরক্ষার অজুহাতে সেখানে রিসিভার নিয়োগ করে। মসজিদ তালাবন্ধ করা হয়। মূর্তিগুলি মসজিদে থেকেই যায়। এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ২০০ মিটারের মধ্যে কেউ নামাজ পড়তে পারবে না। কিন্তু বিতর্কিত এলাকার মধ্যে যে বেদি সেখানে পূজার্চনার জন্য রিসিভার ৪ জন পূজারী নিয়োগ করে দেন। একের পর এক মামলা চলে। সেই মামলাগুলিতে মসজিদের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টাই অনালোচিত থেকে যায়। কেবল পূজার অধিকার কত বিস্তৃত বা সীমাবদ্ধ হবে, তা নিয়েই শুনানি ও রায় চলতে থাকে, যেন ওখানে মসজিদ বলে কিছু ছিল না।

মসজিদের দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা তালা হিন্দুদের জন্য খোলার ব্যবস্থা করে দেন রাজীব গান্ধী

ভোটের স্বার্থে বিজেপি-র হিন্দুত্ব প্রচারের মোকাবিলায় নিজেদের হিন্দুপ্রেমী দেখাতে মন্দির-মসজিদের সমস্যাটিকে ১৯৮৬ সালে খুঁচিয়ে তোলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। কংগ্রেস চিরকালই ভোটসর্বস্ব রাজনীতির ঘৃণ্য খেলা খেলতে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত-উগ্র প্রাদেশিকতাকে উস্কে দেশময় দাঙ্গা বাধিয়েছে। সেই অর্থে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গারস্রষ্টা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসমষ্টির সমর্থন ভোটবাক্সে টানার লক্ষ্যে তারা আদালতকেও ব্যবহার করেছে। আবার, সংখ্যালঘু মুসলিম জনসাধারণকে চাপে রেখে তাদের ত্রাতা সেজে তাদের সমর্থনকেও ভোটবাক্সে বন্দী করতে চেয়েছে। ১৯৮৬ সালে কংগ্রেস তেমন খেলাই খেলেছিল রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে। শাহবানু মামলাকে ভেস্তে দিয়ে মুসলিম মৌলবাদীদের তোষণ করার পর বাবরি মসজিদের তালা খুলে হিন্দুত্ববাদীদের প্রতি তোষণের রাস্তা নেয় কংগ্রেস।

১ ফেব্রুয়ারি ফৈজাবাদের জেলা আদালতের মাধ্যমে একতরফা শুনানির ভিত্তিতে এক রায় জারি করা হয়। তাতে বাবরি মসজিদের ৩৯ বছরের বন্ধ তালা খুলে দেওয়ার নির্দেশ ও মসজিদের মধ্যে রামপূজার অধিকার দেওয়া হয়। নেহরু পরিবারের আপনজন, রাজীব গান্ধীর বন্ধু ও কংগ্রেসের তখনকার বড় মাপের নেতা অরুণ নেহরু এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে 'মুসলিম কার্ড' খেলতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে 'মুসলিম মহিলা বিল' পাস করানো হয়েছিল এবং তারপর হিন্দু কার্ড খেলার জন্য অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের তালা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'' বলেছিলেন, ''মসজিদের তালা খোলার দু'দিন পর এক সন্ধ্যায় আমি রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। তখন রাজীব গান্ধী দূরদর্শনে দেখছিলেন—মসজিদের ভিতরে রামলালার পূজা চলছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কে এসব জিনিস দূরদর্শনে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে? তিনি কোনও উত্তর দেননি, মৃদু মৃদু হাসছিলেন, আর পূজা দেখছিলেন। আমি তারপর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম, কে এই সব ব্যবস্থা করেছে? তিনি উত্তরে জানান, আপনি প্রধানমন্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করুন''*(দ্য স্টেটসম্যান, ১৭-১১-১৯৮৯)।*

রামমন্দিরের শিলান্যাস ও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কলঙ্কময় অধ্যায়ও কংগ্রেসের হাত ধরেই

তারপর, ১৯৮৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে হিন্দুভোট আরও সুনিশ্চিত করতে রাজীব গান্ধী আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেন এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদকে বাবরি মসজিদের পাশেই রামমন্দিরের শিলান্যাসের অনুমতি দেন। বাস্তবে ওটাই ছিল ১৯৯২-এর ভয়াবহ দাঙ্গার ও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের শিলান্যাস। মসজিদটি যে ধ্বংস করা হবে এবং সেজন্য যে বিশেষ ট্রেনিং চলছে, এ সংবাদ বহু আগে থেকেই গোয়েন্দা বিভাগ বারে বারে কংগ্রেসের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাওকে জানিয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সামরিক বাহিনী অযোধ্যায় পাঠিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের উপর দায়িত্ব দিয়ে, যে কল্যাণ সিং বাবরি মসজিদ ভাঙায় মদত দিচ্ছিলেন।

শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্টও সেদিন ইচ্ছে করলে বাবরি মসজিদ ধ্বংস আটকে দিতে পারত, কিন্তু করেনি। পরিবর্তে, প্রতীকী করসেবার অনুমতি দিয়ে অর্ডার পাস করে দেয় *(দ্য হিন্দু, ২৪-১০-১০)।* ফলে, সমগ্র রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসে রইল এবং প্রায় ৫০০ বছরের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বাবরি মসজিদ ৫ ঘণ্টা ধরে ধ্বংস করা হল।

তারপর হিন্দু মৌলবাদীদের খুশি করার জন্য নরসিমহা রাওয়ের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সুপ্রিম কোর্টে যে মামলার নিষ্পত্তি হয়নি, সেই বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় অনুসারে রামলালা দর্শনের অনুমতি মিলে গেল। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার আদালতের দোহাই দিয়ে চুপ করে রইল। বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপর রামলালার অস্থায়ী মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ, সেখানে ভাল করে বেড়া দেওয়া ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, বিরাট এলাকা জুড়ে ভাল ছাউনির ব্যবস্থা করা, পূজাপাঠ যাতে সকলে শুনতে পায় তার জন্য মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া, দ্রুত রামমন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং বাবরি মসজিদ নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থেকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসা — প্রতিটি কাজেই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের ভূমিকা পরিষ্কার। তাদের ভোটসর্বস্ব হীন রাজনীতির পরিণামে দেশ জুড়ে ছড়িয়েছে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র বিষ। বারে বারে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় মেতেছে দেশ। উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে।

১৯৪৯ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের বিচারপতিদের রায়দান পর্যন্ত সরকার ও আদালতের ভূমিকা যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে, সবটাই একসূত্রে গাঁথা। রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালত হিন্দুদের 'বিশ্বাস'কেই যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে, তথ্য প্রমাণের ধার ধারেনি। অথচ মুসলিমদের দাবিকে জমির উপর অধিকারের প্রামাণ্য তথ্য না থাকার কারণ দেখিয়ে নস্যাৎ করেছে। এই প্রকট স্ববিরোধিতাও বিচারের মৌলিক নীতিকে লংঘন করে বিচারব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করেছে।

অতএব, গোটা ঘটনায় দেখা গেল, (১) রামচন্দ্র রক্তমাংসের কোনও বাস্তব চরিত্র নয়, মহাকাব্যের একটি কাল্পনিক চরিত্র। (২) রামমন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এ কথার সপক্ষে কোনও ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই, ফলে এ প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা। (৩) স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস এই মন্দির-মসজিদ বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব খুঁচিয়ে তুলে নিজেদের হীন ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে চেয়েছে, আদালতকেও ব্যবহার করেছে। (৪) তাদের এই অপকর্মের ফলে হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদীরা আরও বেশি করে অন্ধ উন্মাদনা ছড়িয়েছে ও শক্তিশালী হয়েছে। যার সুযোগ নিয়ে সংঘ পরিবার ও বিজেপি তাদের সাম্প্রদায়িক এজেন্ডাকে একেবারে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে।

কংগ্রেসের এই অপকর্মের পেছনে দেশের প্রকৃত শাসক মালিক পুঁজিপতিশ্রেণীর পূর্ণ মদত কাজ করেছে। তারাও চেয়েছে, তাদের শোষণ-লুণ্ঠনে দেশের ভয়াবহ বেকারি, দারিদ্র্য, হাহাকার, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে দেশবাসী সাধারণ মানুষ যেন সংগ্রামের ময়দানে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে। বিদ্বেষে, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় মানুষ যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত থাকবে, লুণ্ঠনের রাজ্যপাট চালাতে ততই তাদের সুবিধা। সুতরাং কংগ্রেস ও বিজেপির ভূমিকা জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করছে, শুধুমাত্র এটুকু ভাবলে ঘটনাকে লঘু করে দেখা হবে, প্রকৃত তাৎপর্য ধরা যাবে না। আসলে শাসক শ্রেণী তার প্রধান দুই তল্পিবাহক কংগ্রেস-বিজেপিকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে তীব্র ও ব্যাপক

পাঁচের পাতায় দেখুন

পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গড়দেওয়ানি অঞ্চলের এস ইউ সি আই (সি) দলের সদস্য, আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড ভোলানাথ বর ৩০ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

১৯৬২ সালে এক জনসভায় প্রয়াত জননেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর বক্তব্য শুনে তিনি দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করে নিজেকে দলের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করেন। আমৃত্যু তিনি পার্টি সদস্য হিসাবে নিজেকে দলের দৈনন্দিন কাজের সাথে যুক্ত রাখেন।

এই বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়ত অনিবার্য ছিল না। ৯ বছর আগে পাশের অঞ্চল চৌভাঙ্গিতে জমির মালিকানাকে কেন্দ্র করে এক গণ্ডগোলে কয়েকজন খুন হয়ে যান। সেই ঘটনায় পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করে সিপিএম নেতাদের নির্দেশে কয়েকজন নিরপরাধ এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের নামে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে চার্জশিট দেয়। তাঁদেরই একজন কমরেড ভোলানাথ বর, যাঁকে মধ্যরাতে বাড়ি থেকে পুলিশ তুলে এই মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। ৫ বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। তা সত্ত্বেও তিনি দলের কাজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে যান।

কমরেড ভোলানাথ বরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১ নভেম্বর গড় দেওয়ানি অঞ্চলে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও খোলা মাঠে এই স্মরণসভায় বহু মানুষের সমাগম হয়। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট জননেতা দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সালামত মোল্লা। প্রয়াত কমরেডের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের নানা ঘটনা তুলে ধরে শ্রদ্ধা জানান দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস অজয় সাহা, সেলিম শাহ, ইসমাইল বৈদ্য, ডাঃ জাকির খাঁ।

কমরেড ভোলানাথ বর লাল সেলাম।

কাকদ্বীপে ট্রলারডুবিতে প্রায় দেড়শো মানুষের মৃত্যু

রাজ্য প্রশাসনের চরম অপদার্থতা ও উদাসীনতার নজির

৩০ অক্টোবর কাকদ্বীপে ভয়াবহ ট্রলারডুবিতে প্রায় দেড়শো মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু আবারও নগ্ন করে দিল রাজ্য প্রশাসনের অপদার্থতা ও জনস্বার্থ রক্ষায় চরম উদাসীন চেহারাটা। মুখ্যমন্ত্রীর তড়িঘড়ি কাকদ্বীপ সফর ও মৃতদের পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা, মন্ত্রীর নদীবক্ষে সফর করে মৃতদেহ উদ্ধারের চমক — কোনও কিছু দিয়েই প্রশাসনের শতচ্ছিন্ন চেহারা ঢাকা দেওয়া যাচ্ছে না।

নদীর যে অংশে ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে, সেটি কার অধীন — পূর্ব মেদিনীপুর, নাকি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনের, সেটা স্থির করতেই বহু ঘণ্টা পেরিয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটেছে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ। 'মা শীতলা' নামে একটি ট্রলার সংবাদ পেয়ে প্রায় এক ঘণ্টারও পরে পৌঁছে ১২৫ জন মানুষকে উদ্ধার করে। একটি ছোট মেছো নৌকো দুজনকে উদ্ধার করে, আর একটি মেছো নৌকো পরদিন কাঠের তক্তা ধরে ভাসতে থাকা একজনকে উদ্ধার করে। যদিও, সরকারিভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে, মোট ৯৩ জন জীবন্ত মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু সংখ্যাটি যাই হোক না কেন, এদের একজনকেও সরকারি প্রশাসন উদ্ধার করেনি।

প্রশ্ন হল, রাজ্যের নদী এলাকার প্রশাসন ডুবন্ত মানুষদের উদ্ধারের কী ভূমিকা নিয়েছিল? দুই জেলার উপকূল অঞ্চলে ৬টি থানা আছে। থানাগুলির অধীনে রয়েছে ভাড়া করা কিছু লঞ্চ, যাতে চড়ে পুলিশের উপকূল পাহারা দেওয়ার কথা। রয়েছে কিছু স্পিডবোটও। প্রতিটি জেলায় রয়েছে 'র‍্যাপিড রেসপন্স' ফোর্স। বিপদের সময় এদের কেন দেখা গেল না? এরা তখন কেন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল না?

নদীবহুল এলাকাগুলিতে নৌকো, ফেরি, বোট, ট্রলার ইত্যাদিতে যাতে অতিরিক্ত যাত্রী না ওঠে, তার নজরদারির দায়িত্বও প্রশাসনের। কিন্তু সুন্দরবনাঞ্চলের প্রায় কোথাও সেই নজরদারি নেই। এই নজরদারি থাকলে কাকদ্বীপের আনন্দনগর, বাজারবেড়িয়া, কমলপুর, ভূতমোল্লারপোল প্রভৃতি গ্রামের এত মানুষের প্রাণ এমন বেঘোরে যেত না।

এক বাংলা দৈনিকের সম্পাদকীয়তে এই দুর্ঘটনার জন্য প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীসাধারণকেও দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 'বিধিমাফিক যাত্রী বহন করা হইতেছে কি না, ইহা যাঁহাদের খেয়াল রাখিবার কথা, তাঁহারা খেয়াল রাখেন না। যাঁহাদের বিধি মানিয়া নৌকায় উঠিবার কথা, তাঁহারাও নির্বিকার।... ফিরিবার তাড়া থাকিলে তাঁহাদের যথাসময়ে প্রস্তুত হইতে হইবে। অন্যথায় পরবর্তী ফেরির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহার কোনও বিকল্প রাস্তা নাই। একমাত্র যে বেআইনি বিকল্পটি খোলা, তাহাই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে'।

কী চমৎকার! যাত্রী বহনের জন্য প্রশাসন পর্যাপ্ত ফেরি, নৌকা বা ট্রলারের ব্যবস্থা করছে না, মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী যাতে নৌযানে না ওঠে তার জন্য কোনও প্রশাসনিক নজরদারি নেই, নৌপথে দুর্ঘটনা ঘটে গেলে আপৎকালীন উদ্ধারকার্যের কোনও উদ্যোগ নেই — মানুষ অসহায়ভাবে মরে। প্রশাসনের এ হেন ভয়াবহ ক্রিমিনালসুলভ অপরাধকে কার্যত লঘু করে গরিব যাত্রী সাধারণকে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা কেন, কাদের বাঁচাতে? দুর্ঘটনা ঘটলে এবং তাতে অসহায় মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হলে তাদেরই দায়ী করা হচ্ছে। মৃত মানুষগুলিকে দায়ী করা কত সোজা। অন্তত নিজেদের বিবেককে শান্ত রাখতে, আর তাও না থাকলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিতে এর থেকে 'উন্নত বিকল্প' আর কিছুই হতে পারে না।

অনার কিলিং-এর বিরুদ্ধে দিল্লিতে সভা

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ৩০ অক্টোবর দিল্লির সভায় বক্তব্য রাখছেন বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার। মঞ্চে উপবিষ্ট বিচারপতি অজিত সিং বেইনস, ইলা বেন পাঠক, অধ্যাপক জানকী রাজন, সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড জয়লক্ষ্মী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী।

রুম্পা সাহার মৃত্যু ঃ কারা দায়ী?

শিলিগুড়ির পলিটেকনিক কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী রুম্পা সাহা বিকৃত রুচির কিছু দুর্বৃত্তের বর্বরতার শিকার হয়ে ২৮ অক্টোবর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। ঘটনার ৪০ দিন আগে জানানো সত্ত্বেও অভিযোগ খতিয়ে দেখা বা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি পুলিশ, যার পরিণতিতে সম্ভাবনাময় একটি ছাত্রীর জীবন অকালে শেষ হয়ে গেল। এ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সমাজের ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয় ও প্রশাসনিক গাফিলতিরই প্রতিফলন মাত্র। এই ঘটনার প্রতিবাদে ৩০ অক্টোবর অল ইন্ডিয়া ডি এস ও কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে জড়িত সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, ভবিষ্যতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার জন্য প্রশাসনিক সক্রিয়তা ও তৎপরতা চাই, মেয়েটির পরিবারকে হয়রানি থেকে অব্যাহতি ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে ঝাড়গ্রামে সেচকর্মীদের অবস্থান

সেচ বিভাগের অন্তর্গত কংসাবতী প্রজেক্টের শতাধিক কর্মী দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে সিজনাল মাস্টার রোল কর্মচারী হিসাবে কাজ করে এলেও ক্ষমতাসীন সিপিএম সরকার তাদের স্থায়ীকরণ করেনি। জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চার মাসে যে কাজ হয় সরকার সেটাও বাইরের কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে করাচ্ছে। ফলে এই কর্মীরা কাজ থেকে বঞ্চিত, বঞ্চিত বেতন থেকেও। তীব্র মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারে তাদের বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন গত ২৬ অক্টোবর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে সেচ বিভাগের ৫ ও ৬ নং ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ার্স অফিসের প্রাঙ্গণে সারাদিন অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেয়। বহু কর্মচারী এতে সামিল হন। তাঁরা দাবি করেন, অবিলম্বে তাঁদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। যতদিন না নিয়মিতকরণ হচ্ছে বারো মাস কাজ দিতে হবে। কাজের পরিমাণের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়াররা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দাবিগুলি লিখিতভাবে জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন ধীরেন হাঁসদা, বংশী মাহাতো, সন্তোষ মাহাতো, অজিত জানা, মনুলাল মাহাতো। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক অজিত দাস, সভাপতি ঈশ্বর জানা ও দীনবন্ধু নন্দী। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে বক্তব্য রাখেন চিন্তামণি সাহু।

কমরেড ছায়া মুখার্জী কেন্দ্রীয় কমিটিতে

কলকাতায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির ৩ নভেম্বরের সভায় কমরেড ছায়া মুখার্জী সদস্য হিসাবে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

বিপিটিএ-র রাজ্য সম্মেলন জলপাইগুড়ি শহরে

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ২২তম দ্বিপাক্ষিক রাজ্য সম্মেলন ২৫-২৭ অক্টোবর '১০ অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি শহরে। ২৫ অক্টোবর জলপাইগুড়ি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন। নেতৃবৃন্দ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বিকেল ৩টেয় জলপাইগুড়ি রেলস্টেশন প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য সমাবেশে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান কল্যাণী রায় পৌরোহিত্য করেন এবং অধ্যাপক জয়দেব মণ্ডল, অমল রায়, বিনয় বসু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ২৬ অক্টোবর জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাসভায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখেন মহেশ্বর ভট্টাচার্য, বাণীকান্ত ভট্টাচার্য, কার্ত্তিক সাহা এবং জয়দেব মণ্ডল। এছাড়া সম্মেলনে শিক্ষার সর্বস্তরে পাশ-ফেল প্রথা বজায় রাখা, শিক্ষার স্বার্থে উন্নত মানের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তপন রায়চৌধুরীকে সভাপতি এবং কার্ত্তিক সাহাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

কমসোমলের কলকাতা জেলা শিবির

২৫ অক্টোবর কলকাতা জেলা কমসোমলের পক্ষ থেকে চেতলার কৈলাস বিদ্যামন্দির স্কুলে সারাদিনব্যাপী একটি কিশোর শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহণ করে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য কমিটি ও কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ জেলার বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ও কর্মীরা। শিবিরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি, সঙ্গীত ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রায় ৬০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় কমসোমলের ১১টি দল নাটক পরিবেশন করে। প্রতিযোগিতার শেষে কমসোমলের আগামী কর্মসূচি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন দলের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য, রাসবিহারী-কালিঘাট আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড করুণা ভট্টাচার্য। শেষে প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

বাঁকুড়ার কৃষ্ণনগর হাসপাতালে জনস্বাস্থ্য কনভেনশন

২৯ অক্টোবর ওন্দা থানার কৃষ্ণনগর হাসপাতালে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা ওয়ার্ডে ভর্তি, প্রতিদিন চিকিৎসকদের উপস্থিতি, ওষুধের সংখ্যা বৃদ্ধি, উপযুক্ত শৌচাগারের ব্যবস্থার দাবিতে এক জনস্বাস্থ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কানাইলাল দাস, জয়দেব কর, সমাজসেবী লক্ষ্মীকান্ত নন্দী ও স্বাস্থ্যকর্মী কৃষ্ণা মণ্ডল। প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া। তিনি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বেসরকারিকরণ নীতি কীভাবে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে তা তুলে ধরেন এবং রাজ্য সরকারের গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য সাড়ে তিন বছরের ডাক্তারি কোর্সের তীব্র সমালোচনা করেন। জেলা সম্পাদিকা লক্ষ্মী সরকার জেলা জুড়ে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন। বলেন, জেলার খাতড়া, হিড়বাঁধ, রানিবাঁধ ব্লকেও জনস্বাস্থ্যরক্ষা কমিটি গড়ে উঠেছে। কনভেনশন থেকে জয়দেব করকে সম্পাদক, লক্ষ্মীকান্ত নন্দী ও কানাইলাল দাসকে যুগ্ম সম্পাদক, তাপস ঘোষকে সভাপতি, অর্ধেন্দু ডাঙ্গরকে সহসভাপতি ও কৈশোর ভুঞ্যাকে কোষাধ্যক্ষ করে ২২ জনের আঞ্চলিক 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' গঠিত হয়।

অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস কমিটির উদ্যোগে তপসিয়ায় আলোচনা সভা

৩০ অক্টোবর অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস কমিটির উদ্যোগে তপসিয়ার আওলাস হাসান অ্যাকাডেমি স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭টি স্কুলের প্রায় দু'শো ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সভাপতি আয়সানুল হক উর্দু ভাষায় প্রশ্নপত্রের দাবিতে আন্দোলনের ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান। বক্তব্য রাখেন কমিটির সম্পাদক ইমতিয়াজ আলম, এ এইচ ইসলামিক অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক কাওসর আলি, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ডঃ মেহবুব আলম। প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ এ কে পোদ্দার।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়

চারের পাতার পর

করে ব্যাপকতম জনগণের ঐক্যকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করছে। এ কাজে তারা হিন্দুত্বকে যেমন প্রধান হাতিয়ার করে, তেমনই মুসলিম মৌলবাদকেও নানাভাবে প্রশ্রয় দেয়। পার্লামেন্টারি ক্ষমতার অংশ দখলের প্রশ্নে ঐ দুই দলের দ্বন্দ্ব যেমন থাকে, বোঝাপড়াও থাকে। দ্বিদলীয় গণতন্ত্র আজ সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের সমস্যাকে হাতিয়ার করে ফ্যাসিবাদী শাসন চালাচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায় সামগ্রিক এই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হিসাবে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করবে। এই রায় সভ্যতার এই বিপর্যয়ের মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত হবে।

এ কথাটাই স্পষ্ট ভাষায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রেস বিবৃতিতে বলেছিল —এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় পৌরাণিক কাহিনীর এক চরিত্রকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে দেখাতে চেয়েছে, যা আধুনিক বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। তদুপরি, ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ড, বর্বরতায় যা আফগানিস্তানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের তালিবানি কাজের সাথেই একমাত্র তুলনীয়, এই রায় তাকেই আইনসঙ্গত ও ন্যায়সম্মত করে দিয়েছে।

আমাদের জীবনে পার্টি কমিউন ও পার্টি সেন্টারের গুরুত্ব

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার কুলতলির জামতলায় ২০ অক্টোবর একটি পার্টি সেন্টারের উদ্বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। 'কমরেড সুধীর হালদার স্মৃতি ভবন' নামাঙ্কিত পার্টি সেন্টার উদ্বোধন করার পর.. সমবেত পার্টি কর্মী-সমর্থক-দরদীদের উদ্দেশে কমরেড ইয়াকুব পৈলান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, কুলতলির জামতলায় পার্টি সেন্টার উদ্বোধন করতে এসে আমি সর্বপ্রথম এই জেলার সাধারণ মানুষকে, কর্মী-সমর্থক-দরদীদের, বহু শহিদ পরিবারের সদস্যদের বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ এই জেলাতেই ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল ভারতের শোষিত জনগণের তথা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জেলাতেই প্রথম মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে খেতমজুর-ভাগচাষি-গরিব চাষিদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে পার্টির শক্তিশালী গণভিত্তি গড়ে ওঠে। এই জেলাতেই শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলতে গিয়ে জোতদার-কংগ্রেস-সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশের নৃশংস আক্রমণে দেড়শতাধিক কমরেড শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন। সিপিএমের ষড়যন্ত্রে ৪৯ জন কমরেড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বন্দী হয়ে আছেন। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এই জেলার এই ভূমিকা ও আত্মদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটাও প্রশংসনীয় যে, এই জেলার প্রথম শহিদ এবং সেই অর্থে দলের প্রথম শহিদের নামেই এই পার্টি সেন্টারের নামকরণ করা হয়েছে 'কমরেড সুধীর হালদার স্মৃতিভবন'।

এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই আমাদের দল কেন পার্টি কমিউন ও পার্টি সেন্টারের উপর এত গুরুত্ব দেয়। আপনারা জানেন, আমাদের দল এ দেশের মাটিতে একমাত্র যথার্থ মার্কসবাদী দল। মহান মার্কসই দুনিয়ার শ্রমিক-খেতমজুর-গরিব চাষিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, তোমরা শোষণকে পাল্টাবে, দুনিয়াকে পাল্টাবে, কিন্তু তার জন্য নিজেদের পাল্টাতে হবে। নিজেদের না পাল্টালে দুনিয়াকে তোমরা পাল্টাতে পারবে না। এ কথার অর্থ কী? যে শ্রমিক, যে গরিব, সে টাকা-পয়সার দিক থেকে গরিব, কিন্তু তার মধ্যে পুঁজিবাদের বিষ আছে। গরিবের মধ্যেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি করার লোভ আছে, সম্পদের মালিক হওয়ার লোভ আছে, লাভ করার মানসিকতা আছে। লোভ এবং লাভ করার এই মানসিকতা এই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকে। একজন গরিব মানুষও সুযোগ পেলে বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করে। মালিক হয়ে অন্যকে খাটিয়ে লাভ করতে পারার মন তাঁর মধ্যেও কাজ করে। এই মনটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী মন, বুর্জোয়া মন। আর একটা চিন্তাও থাকে, তা হচ্ছে, আমি যে গরিব সেটা আমার পাপের ফল, পূর্বজন্মের কর্মফল, আমার অদৃষ্টের লিখন। এই মন থাকলে গরিব খেতমজুর গরিব চাষি শোষণ-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়বে কী করে? নিজের মধ্যেকার লোভ ও লাভের আকাঙ্খা থেকে মুক্ত না হতে পারলে গরিব মানুষও শোষণকে পাল্টাতে পারবে না। এ জন্যই মার্কস বলেছিলেন, যাঁরা পাল্টাবে দুনিয়াকে, শোষণ ব্যবস্থাকে যাঁরা পাল্টাবে, তাঁরা আগে নিজেদের পাল্টাও। এই পাল্টাও মানে হচ্ছে নূতন চরিত্র চাই, নূতন মনুষ্যত্ব চাই। মার্কসের এই যে শিক্ষা, আবার তাকে ভিত্তি করে লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-এর শিক্ষা, মহান নেতাদের সকল শিক্ষাগুলোকে আরও উন্নত, বিকশিত করে কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে নতুন মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষা, উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, যাঁরা এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের নেতা হবেন, উচ্চ স্তরের ভূমিকা পালন করবেন, তাঁরা শুধু সম্পত্তির মালিকানা ছাড়বেন তাই নয়,ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত মানসিকতা, স্নেহ-প্রেম-মমতার নামে ব্যক্তিগত সম্পর্কভিত্তিক দুর্বলতাও ছাড়বেন। আমরা লড়ছি কীসের জন্য? লড়ছি কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কমিউনিস্ট সমাজ মানে যেখানে কোনও ব্যক্তিসম্পত্তির মালিক থাকবে না। গোটা সমাজই হবে সম্পত্তির মালিক। সকলে মিলেই উৎপাদন করছে একত্রে এবং সকলে মিলেই উৎপাদিত সামাজিক সম্পদ ভোগ করছে। সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ, লাভ, লোভ, ওকে বঞ্চিত করে কিছু পাওয়া, ওকে ঠকিয়ে কিছু পাওয়া— এই মনোভাবটাই থাকবে না। আমি একটু বেশি নেব, ওকে একটু কম দেব, ওকে ঠকিয়ে কিছু ম্যানেজ করব, ও না খেয়ে মরুক আমি ফিরেও তাকাব না, আমারটা হলেই হল— এই যে মন আমাদের মধ্যে আছে, এই মনটাই থাকবে না। সমাজকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমাদের লড়াই, যেখানে ধনী-গরিব এই বৈষম্য থাকবে না। মানুষের যত প্রয়োজন বাড়ছে, সকলে মিলে উৎপাদন করছি সেই অনুযায়ী। যত উৎপাদন করছি, যার যা প্রয়োজন পাচ্ছি, সবাই মিলে একটা পরিবার গড়ে তুলছি। আমরা সে দিকেই যাচ্ছি।

বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

আজকে অনেকের কাছে এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা অসম্ভব ও কাল্পনিক বলেই মনে হবে। কিন্তু ইতিহাসে মার্কস-এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম বলেছিলেন, দুনিয়ায় ধনী-গরিব বৈষম্য চিরদিন ছিল না, চিরদিন থাকবে না। এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব। কয়েক হাজার বছর আগেকার ধর্ম প্রচারকরাও বড় মানুষ ছিলেন, তাঁরাও গরিব মানুষের দুঃখে কেঁদেছিলেন। কিন্তু সে যুগে আধুনিক বিজ্ঞান আসেনি,বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তে চিন্তার সুযোগ তাঁরা পাননি, আধ্যাত্মিক পথেই তাঁরা সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন। সেই অনুযায়ী তাঁরা মনে করেছিলেন, এই জগৎ সৃষ্টি করেছে ও পরিচালনা করছে এক ঐশ্বরিক শক্তি, সমাজের সবকিছু এবং ধনী-গরিবও ভগবানের সৃষ্টি। ধনী ও গরিব যে যার পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করছে। এই চিন্তাকে ধনীরাই সবসময় ব্যবহার করেছে। এই ধর্মপ্রচারকরাই বর্তমান জন্মে বা এই পৃথিবীতে গরিবদের জন্য কোনও উপায় বাতলাতে না পেরে কল্পনা করে বলেছিলেন, এই জন্মে গরিবরা পুণ্যার্জন করলে মৃত্যুর পর স্বর্গ বা বেহেস্তে গেলে প্রকৃত সাম্য পাবে, কারণ স্বর্গে ধনী গরিব থাকে না। এ কথা ঠিক যে, ফরাসি বিপ্লব এই পৃথিবীতেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ধ্বনি তুলেছিল, কিন্তু বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বাস্তবে এই সাম্যকে প্রতিষ্ঠা করার পথ দেখিয়েছেন মার্কস আধুনিক বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে। তাই মার্কসের সহযোদ্ধা এঙ্গেলস বললেন, ধর্মপ্রচারকরা মৃত্যুর পর যে সাম্যের কল্পনা করেছিলেন স্বর্গে, আমরা বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে সেই স্বর্গ অর্থাৎ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করছি এই পৃথিবীতেই। এটাকেই কমিউনিজম বলে।

আজ আমরা যে পুঁজিবাদী সমাজে বাস করি, সেখানে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি দেশের কৃষি উৎপাদন-শিল্প উৎপাদন সবকিছু কন্ট্রোল করছে, ব্যবসা কন্ট্রোল করছে। তাদের লাভের জন্যই উৎপাদন হচ্ছে। তারা লাভ করে শ্রমিকদের, খেতমজুর-গরিব কৃষকদের শোষণ করে। এই ব্যবস্থাটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী মালিকানা ব্যবস্থা। এখন এই মালিকানা ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা গোটা দেশের ৯০ ভাগ সম্পত্তি কন্ট্রোল করছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। তারাই লাভ করছে, তারাই মুনাফা করছে। যার জন্য দেশে কোটি কোটি বেকার। কয়েক কোটি শ্রমিক ছাঁটাই। কোটি কোটি মানুষ অনাহারে ধুঁকছে, বিনা চিকিৎসায় মরছে, মানুষ পথের ভিখারি হচ্ছে। এই ব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তির স্বার্থেই সম্পত্তি। ব্যক্তির স্বার্থে সম্পত্তিবোধ কিন্তু আমাদের সকলেরই আছে। আজ যে দু'বিঘা বা এক বিঘা জমির মালিক, এমনকী দশ কাঠা জমির মালিক, বা যার একটা সামান্য চায়ের দোকান আছে,সে-ও ঐ সম্পত্তি বা ব্যবসা বড় করতে চায়। পারুক না পারুক, চায় আরও বেশি সম্পত্তি হোক। এই মনটা কিন্তু পুঁজিবাদী মনই। ক্ষুদ্র পুঁজি বৃহৎ পুঁজির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ওদিকে আবার বৃহৎ পুঁজি ক্ষুদ্র পুঁজিকেও গ্রাস করছে। একবিঘা-দু'বিঘা জমির মালিক হলে, তার জমি চলে যাচ্ছে বড় জোতের মালিকের গর্ভে। কম্পিটিশনে ছোট ছোট দোকান উঠে যাচ্ছে। দেখছেন না, বিগ বাজার এখান পর্যন্ত এসে যাচ্ছে, এখানেও বিগ বাজারের তোড়জোড় হচ্ছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখন প্রায় চায়ের দোকান পর্যন্ত করছে। আম্বানি-টাটা-বিড়লারা বাজার কিনে ফেলছে, মানে সবকিছু তারা গ্রাস করছে। ক্ষুদ্র মালিকরা বড় মালিকদের সাথে কম্পিটিশনে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু মালিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে। এই যে মালিকানা বোধ, এখান থেকে আসছে ব্যক্তিস্বার্থবোধ। আগে নিজেরটা দেখো— 'আপনি বাঁচলেই বাপের নাম' 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'এই যে মানসিকতা, তা আমাদের রক্তমজ্জায় আছে। ফলে, আমার একটু সম্পত্তি বাড়ুক, আমার একটু নাম হোক, আমার প্রচার হোক, আমি একটা ভাল পোস্ট চাই, সকলে আমার সুনাম করুক, খারাপ কাজকর্ম করলেও আমার সুনাম করুক— এই যে আমি এতসব চাই, এই সবকিছুর মধ্যেই 'আমি' ব্যাপারটা আছেই। এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী মন। আমরা যাঁরা দলে যুক্ত হই, তাঁরাও এই পুঁজিবাদী মন নিয়ে দলে আসি। আমরা কমিউনিস্ট হয়ে কেউ এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলে যুক্ত হই না। কমরেড শিবদাস ঘোষের আবেদনে আমরা সাড়া দিয়ে দলে যুক্ত হই। কিন্তু আমাদের যে ঘরে জন্ম, যে গ্রামে বা যে শহরে জন্ম, যে স্কুল-কলেজে আমাদের পাঠ, কোথাও তা আমাদের কমিউনিস্ট হওয়ার, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর মেম্বার হওয়ার শিক্ষা দেয়নি। বরঞ্চ নিজেরটা দেখ, আগে নিজের স্বার্থ বোঝ এরকম শিক্ষাই আমরা পাই। এই ধারণাগুলোই আমাদের রক্তে-মাংসে মিশে থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, এই ভাবটা খুব প্রবল। কেউ উঁচু জাত, কেউ নীচু জাত এসব চিন্তাও খুব প্রবল। হিংসা, বিদ্বেষ, অন্যকে খাটো করা, নিজেকে মাতব্বর কেউকেটা বলে জাহির করা— এই ধরনের মন নিয়েই আমরা আছি।

মার্কসের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, এসব মানসিকতা থেকে যদি নিজেদের মুক্ত করে পাল্টাতে না পার, তা হলে তোমরা সমাজকে পাল্টাতে পারবে না। সেজন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় যাঁরা প্রথমে দলে এসেছিলেন— কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড হীরেন সরকার, কমরেড প্রীতিশ চন্দ এবং পরবর্তীকালেও যাঁরা নেতৃত্বে এসেছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, থাকলে দলের জন্য, আন্দোলনের জন্যই দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শুধু এটাই যথেষ্ট নয়। তার চেয়েও আর একটা কঠিন সংগ্রাম আছে, সেটা হচ্ছে, আমার স্বামী বলেই সে ভালো হোক-মন্দ হোক, তাঁর প্রতি আমি দুর্বল; আমার স্ত্রী বলেই সে ভালো হোক-মন্দ হোক, তার প্রতি আমি দুর্বল; আমার ছেলেমেয়ে ভালো হোক-মন্দ হোক তার প্রতি আমি দুর্বল— এই যে ব্যক্তিগত সম্পর্কভিত্তিক স্নেহ-মমতা, যেখানে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি, এর থেকেও মুক্ত হতে হবে। মুক্ত হতে হবে আমাদের মধ্যে নেতা হওয়ার লোভ, নাম করার লোভ, পদে যাওয়ার লোভ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ থেকে। দেববাবু আমার পরে দলে এসেছেন, আমি দেববাবুকে দলে এনেছি, দেববাবু এখন আরও যোগ্য হয়ে এগিয়ে গেছেন আমার থেকেও। আমার কিন্তু হিংসা হচ্ছে। সবাই দেববাবুর প্রশংসা করছে, আমাকে করছে না। এজন্য আমার ভেতরে একটা জ্বালা হচ্ছে, আমি দেববাবুর খুঁত ধরার চেষ্টা করছি, যেভাবেই হোক সকলের সামনে ওনাকে অপদস্থ না করতে পারলে আমার শান্তি নেই। আবার, পৈলানসাহেব হয়তো সঠিকভাবে আমার একটা ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন আমাকে সাহায্য করার জন্য, উপকার করার জন্য। কিন্তু তাতে আমার রাগ হয়েছে, আমি ভেতরে ভেতরে ভাবছি পৈলানসাহেবকে আমি দেখে নেব, দিন আসুক। আমার চেয়ে বয়সে ছোট, আমি একটা যুক্তি বলেছি, সে আর একটা যুক্তি বলেছে, ওর যুক্তিটা সঠিক। কিন্তু আমি যেহেতু সিনিয়র, বয়সে বড়, আমি ওর যুক্তিটা মানতে পারছি না। আমাদের মায়েরা যেরকম বলত মেয়েকে, তুই আমার পেটে হয়েছিস না আমি তোর পেটে হয়েছি যে তোর থেকে আমাকে শিখতে হবে? আমিও সিনিয়র হয়ে সেরকম ভাবছি। ফলে দুই ধমক দিয়ে জুনিয়রকে বসিয়ে দিলাম— কালকের ছেলে, তুমি কী বোঝ? এখানে সত্যের মূল্য দিলাম না, যুক্তির মূল্য দিলাম না। আবার, আগে আমি জুনিয়র ছিলাম, ভদ্র, নম্র ছিলাম, কিন্তু এখন নেতা হয়ে নিজেকে কেউকেটা মনে করে সিনিয়রদের প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছি না। এই মানসিকতাগুলো থাকলে, কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, আমি যা চেয়েছি সেটা হবে না। এইসব কারণে আমাদের দলের ভেতরে খুব কঠিন সংগ্রাম চলে, যেটা বাইরের মানুষ ধরতে পারে না। বাইরের

সাতের পাতায় দেখুন

মার্কিন থাবার নিচে ইরাক আজ ধ্বংসস্তূপ

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে বৃহৎশক্তির দানবীয় মনোভাব চিরাচরিত ভাবেই ভয়ঙ্কর। সদাশয় মুখের আচ্ছাদনে লুকিয়ে রাখে লকলকে জিভ। যাতে থাকে ভয়ঙ্কর মারণ বিষ। তীক্ষ্ণ দাঁত-নখে মিশে থকে রক্ত আর মাংসের গন্ধ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে কোনও সময় একটা অজুহাত তৈরি করে মাতব্বরিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নির্লজ্জ বর্বরভাবে ধ্বংসে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঠিক এমনটাই করেছে ইরাকে। সেখানকার অর্থনীতি, ঐতিহ্যময় প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সবকিছু ধ্বংস করে, মানুষগুলিকে নিঃস্ব করে, অকেজো করে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে — এই অজুহাত দিয়ে এবং সে দেশের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে পরমাণু অস্ত্রের গোপন কারবারি ও গোটা দুনিয়ার বিপজ্জনক শত্রু বলে প্রচার করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইরাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রশ্ন জাগে, কে সাদ্দামকে হঠাবার জন্য আমেরিকাকে ডেকেছিল? সমস্তটাই কি সার্বভৌম রাষ্ট্র ইরাকের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ছিল না? যতই তাদের নৈরাজ্য থাকুক, যতই ইরানি নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কা থাকুক, আজও ইরাকি জনতা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই বুঝে নিতে চায়। কোনও বিদেশি মাতব্বরকে তারা কখনও কোনওদিন ডাকেনি, কারণ প্রতিটি দেশেরই আত্মসম্মানের প্রশ্ন থাকে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সে সবের ধার ধারে না। মাথা তুলে কথা বললেই সে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চায়। এমনিতেই হিটলিস্টে ইরান, ইরাক এবং উত্তর কোরিয়ার নাম লিখে শিকারি বাঘের মতো ওৎ পেতে বসেছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সুযোগ তৈরি হতেই ইরাকের ক্ষেত্রে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে একটুও পিছপা হয়নি সে। জর্জ বুশ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের তকমা আঁটা লোলুপতার অভিযান চালিয়ে সাদ্দাম হুসেনকে বন্দী করে বিচারের প্রহসন চালান এবং শেষপর্যন্ত ফাঁসিকাঠে ঝোলান। ইরাকি সেনাবাহিনী ধ্বংস করে, সেখানে মার্কিনবাহিনীর আধিপত্য স্থাপন করা হয়। ইরাকের ক্ষমতার শীর্ষে পুতুল সরকার বসিয়ে সে পুতুলের সুতো নিজেদের হাতে রাখার গোপন প্রচেষ্টাতেও সফল হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সাত বছর ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাকে নানা ভাবে ঘুঁটি সাজিয়েছে, বিভাজন নীতির খেলায় মাতোয়ারা থেকেছে। কিন্তু বরাবরই নিজের ভুলে নিজেই জর্জরিত হয়েছে। তাই ইরাকে আজও শিয়া-সুন্নি-কুর্দদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অব্যাহত থেকেই গেছে। মার্কিন কমব্যাট ফোর্স অর্থাৎ যুদ্ধ সেনা সেখানে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে। সাদ্দাম হুসেন সুন্নি সম্প্রদায়ের হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য ছিল, শিয়াদের থেকে শাসক তৈরি করে তাকে ক্ষমতার উচ্চাসনে বসিয়ে স্থায়ীভাবে ইরাককে মার্কিন অধীনস্থ করে রাখা। কিন্তু পরে তাদের টনক নড়ে যে, ইরান শিয়াশাসিত দেশ। ফলে সম্ভাবনা রয়েছে ইরান-ইরাক যৌথ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গোষ্ঠী তৈরি হওয়ার। এ ঘুঁটিও পাল্টাতে হবে। ফলে এবার কুর্দ সম্প্রদায়ের দিকে ঝোঁকা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাকি সেনাবাহিনী থেকে সাদ্দাম সমর্থকদের তাড়িয়ে দিয়ে আজ্ঞাবহদের নিয়ে নতুন বাহিনী তৈরি করেছে। এখন অদৃশ্য সুতোর টানে ইরাকের সেনাপ্রধানরা আমেরিকার পক্ষেই গান গাইছে। বাগদাদ কনফারেন্সে ইরাকি সেনাবাহিনীর প্রধান কুর্দ সম্প্রদায়ভুক্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাবারি, ২০২০ সাল পর্যন্ত, যতদিন না ইরাকি সৈন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংনির্ভর হতে পারছে, মার্কিন সেনাদের ততদিন পর্যন্ত ইরাকে অবশ্যই থাকা উচিত বলে মত পোষণ করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইরাক একজিট পলিসি' অর্থাৎ ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার নীতি কোনও সরল বিষয় নয়। সেনা প্রত্যাহারের জন্য একবার করে দিন নির্ধারিত হবে এবং তা বাতিল হবে — এ জিনিস যে চলবে, এ জানা কথা। ঠাণ্ডা মাথায় বুশ প্রশাসন ইরাকি নিধন শুরু করেছিল। ২০০৮ সালে বারাক ওবামা নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতায় বসে ২০০৯-এ ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার নীতি ঘোষণা করে নিজের দেশের যুদ্ধবিরোধী জনগণের মন জয়ের চেষ্টা করেন। ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের ধিক্কারের সামনে দাঁড়িয়ে ওবামা তাদের বিভ্রান্ত করতে ঘোষণা করলেন, যেহেতু যুদ্ধ শেষ, তাই শুধু 'কমব্যাট ফোর্স' তথা যুদ্ধ সেনারাই ঘরে ফিরবে। যুদ্ধ বাদে অন্যান্য কাজে যুক্ত সেনারা, সংখ্যায় যারা ৫০ হাজার, তারা ফিরবে ২০১১ সালে।

সাম্রাজ্যবাদের স্বভাবই হল হিংস্র আগ্রাসন। তাই সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় যেই বসুক — জর্জ বুশ বা বারাক ওবামা, পার্থক্য কিছুই নেই। 'কমব্যাট ফোর্স' চলে আসা মানে যেমন ইরাকের মুক্তি নয়, তেমনই ২০১১ সালে যদি সত্যিই ৫০ হাজার অন্যান্য সেনারা ইরাক ছেড়ে আমেরিকামুখী হয়, তাহলেও ইরাক মার্কিন আগ্রাসনমুক্ত হবে না। কারণ ইতিমধ্যেই সেখানে এক লক্ষ বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা আছে, তারা মার্কিন মদতে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক সংগ্রহ করে এবং আমেরিকা ইরাকে তাদের নানা কাজে নিয়োগ করেছে। এগারো হাজার বেতনভুক ভিনদেশি সৈনিক আছে। তারাও তৃতীয় বিশ্ব থেকে সংগৃহীত। অর্থাৎ মার্কিন মুখগুলি সরিয়ে অন্য মুখগুলিকে মুখোশ করে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে চায় সেখানে। এতে সুবিধা অনেক। হইহই কমে আসবে। বেতনভুক ভিনদেশি সৈনিক ও কর্মীরা জানবে না তাদের আসল মালিক কে, কী কাজের সাথে যুক্ত। তারা জানবে, তাদের পরিবার জানবে তারা চাকরি করছে। ২৪টা ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার এবং ৫০ টা বিশেষ ল্যান্ডমাইন প্রতিরোধকারী অত্যাধুনিক মিলিটারি গাড়ি বেশ নিশ্চিন্তে বিরাজ করছে। টাইগ্রিস নদীর তীরে একশ চার একর জায়গা নিয়ে আমেরিকান এমব্যাসি তৈরি হয়েছে। সবই নাকি ইরাককে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে! নিউইয়র্ক টাইমসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মেজর জেনারেল স্টিফেন

আটের পাতায় দেখুন

কুলতলিতে কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

ছয়ের পাতার পর

সকলে ভাবে, এই দলের কর্মীদের জাতটাই আলাদা, গুলি করে সকলকে মেরে দিলেও কিচ্ছু করা যাবে না, রক্ত থেকে আবার জন্ম নেবে। এই শক্তির আসল উৎস হচ্ছে কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষা, যা আমরা সকলে বুকে বহন করে চলছি। এ শুধু বক্তৃতা করলে হবে না, বই পড়লেও হবে না। বই পড়ে আমরা জানি, বক্তৃতা শুনে জানি কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়। এর দরকার আছে। আবার আমি যা পড়েছি, তা ঠিকমতো বুঝেছি কি না, যা শুনেছি তা বুঝেছি কি না, সেটা বোঝা যায় কী দিয়ে? আমার ব্যবহার, আচরণ, চলায়-ফেরায় তা বোঝা যায়। চরিত্র বোঝা যায় আচার-ব্যবহারে। এক খণ্ড হীরের টুকরো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করে কী করে? কয়লার মধ্যে ফেললেও তা জ্বলজ্বল করে, কাঁচ কিন্তু জ্বলজ্বল করে না, সোনাও করে না। চরিত্র হচ্ছে হীরের টুকরো। সেজন্য আচারে-ব্যবহারে হাঁটায়-চলায়, কথাবার্তায় বোঝা যায় একজন বিপ্লবীকে। চায়ের দোকানে যখন বসে একজন বিপ্লবী, ট্রেনে যাচ্ছে, বাসে যাচ্ছে, কোনও বাড়িতে আছে, এমনকী স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রেও বোঝা যায় স্বামীর আচরণ —সব কিছুর মধ্যে বোঝা যায় যে মানুষটা আলাদা। এর আচার-ব্যবহার-চরিত্র আলাদা। যখন ঝড়ঝাপ্টা আসে, মর্মান্তিক আঘাত আসে, চরম পরাজয় আসে তখনও চেনা যায়, চেনা যায় দুঃখ-শোক, রাগ-বিরক্তির মধ্যেও। একেবারে দেহ-মনে সম্পূর্ণ পাল্টে যাওয়া, নতুন মানুষ হওয়ার জন্যই এই লড়াই। এই নতুন মানুষ হওয়ার যে লড়াই, তার একটা দিক হচ্ছে পার্টির সেল, লোকাল কমিটি, জেলা কমিটি যেখানে কর্মীদের মধ্যে চর্চা হয়, কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়, তার ভিত্তিতে কাজকর্ম হয়, আন্দোলন হয়, লড়াই হয়, একে অপরের ভুল বোঝায়, একে অপরের থেকে শিক্ষা নেয়। এই সংগ্রাম যেমন দলের মধ্যে চলে, তেমন এই সংগ্রামেরই আর একটা ক্ষেত্র হচ্ছে পার্টির সেন্টার, পার্টির কমিউন। কমিউনটা সর্বোচ্চ স্তর। তার আগের ধাপ হচ্ছে পার্টির সেন্টার।

পার্টির সেন্টার মানে শুধু কয়েকজন একত্রে থাকা নয়, খাওয়া নয়, শোওয়া নয়। পার্টির সেন্টার মানে যারা একত্রে থাকছে যারা এক বিছানায় থাকছে, এক রান্নাঘরে খাচ্ছে, একত্রে শুচ্ছে, উঠছে, বসছে, কথা বলছে, গল্পটল্প হচ্ছে, কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাদের নিয়েএকটা পরিবার তো। এই পরিবারে কে হিন্দু ঘরের, কে মুসলিম ঘরের, কে কী জাত, এ সব কিচ্ছু নেই। আমাদের একটাই ধর্ম, একটাই জাত , আমরা এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের কর্মী। এই হচ্ছে আমাদের পরিবার। এই একত্রে থাকার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকে সকলেরটা দেখে, নিজেরটা আলাদা করে দেখে না— খাওয়াতেও নয়, শোওয়াতেও নয়, বসাতেও নয়। এগুলি সূক্ষ্মভাবে বোঝা যায়। খাওয়া, শোওয়া, বসা, ওঠা সব ব্যাপারেই সকলের ব্যাপারটা সকলে দেখছি— এ সব শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার দেববাবু হয়ত সবটা দেখছেন, আমি কখনও দেখি, কখনও দেখি না। কখনও পারি, কখনও পারি না। আর পৈলানসাহেব হয়ত একদম পারেন না, বা অল্প অল্প পারেন। এই যে পার্থক্যটা হচ্ছে, এই পার্থক্য একে অপরকে ধরিয়ে দিচ্ছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে। এই সেন্টারে আমি থাকি, আমিও দলের কর্মী, আমার স্ত্রীও দলের কর্মী, আমার স্ত্রীও দলের সেন্টারে থাকে। ধরে নিন, দেববাবুর স্ত্রী পার্টি কর্মী, সেও সেন্টারে থাকে। (ঠাট্টাচ্ছলে হেসে) যদিও দেববাবু বা আমার সে সৌভাগ্য হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলছি আর কি! ধরুন আমাদের স্ত্রীরা থাকছে, স্ত্রীদের মধ্যে কোনও কারণে রান্নাঘরে ঝগড়া হয়েছে। স্ত্রী রাত্রিবেলা দেববাবুকে বলেছে, আমাকেও বলেছে। সকালবেলা আমরা আর একত্রে চা খেতে পারছি না। যা সাধারণ পরিবারে আজকাল ঘটে। বোঝা গেল, ওর স্ত্রীও রাত্রে ওর কান ভারি করেছে, আমার স্ত্রী আমার কান ভারি করেছে। তাহলে কি আমরা কমিউনিস্ট? এ তো হচ্ছে পারিবারিক দুর্বলতা। আমার স্ত্রী আমার জন্য একটু বেশি ভাবে, ওর স্ত্রী ওর জন্য বেশি ভাবে, এ সব সেই একই পারিবারিক দুর্বলতা। নিজের সন্তানের জন্য বেশি ভাবে। তা হলে সব সন্তানের আমি মা নই, সব সন্তানের আমি পিতা নই। এই বোধটা অর্জন করতে পারিনি। এই বিষয়গুলো এক ছাদের তলায় থাকলে, এক ঘরে থাকলে অনেক বেশি বোঝা যায়। এটা মেস নয় যে, খাওয়া-দাওয়া-শোওয়ায় একত্রে থাকার সুবিধার জন্য আমরা আছি। কমিউন-সেন্টারে খাওয়াতে, শোওয়াতে, বসাতেও, একত্র থাকাতেও আমি কমিউনিস্ট। আমরা শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হতে চাই। অবশ্য চাইলেও এক ধাক্কায় হওয়া যায় না, অনেক ভুলভ্রান্তি হবে, অনেক ফাটাফাটি হবে, তর্কবিতর্ক হবে। আমার গায়ে কাদা থাকলে আমি বুঝছি না, উনি আমাকে বুঝিয়ে পরিষ্কার করছেন। ওনার থাকলে আমি পরিষ্কার করছি। এই যে লড়াইটা, এই লড়াইটা করার জায়গা হল সেন্টার।

লড়াই করার এত সুযোগ অফিসেও থাকে না। অফিসে তো আমরা একত্রে থাকতে যাই না, অফিসে কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। তাতেও একটা অ্যাসোসিয়েশন থাকে, সেল-লোকাল-ডিস্ট্রিক্ট কমিটিতে, জেনারেল মিটিংয়ে অনেক আলোচনা হয়, জিবি মিটিংয়ে অনেক আলোচনা হয়। কিন্তু সেন্টার লাইফ আরও কঠিন সংগ্রাম। একজন সকলের বিছানাই তোলে, আর একজন আগে উঠে যায় যাতে অন্য কেউ বিছানা তুলে দেয়। একজন তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে যায়, যাতে হাঁড়িটা তাকে মাজতে না হয়, অন্য কেউ মাজবে। এই সব ছোট ছোট জিনিসগুলো এসে যায়। আমার ছেলের জন্য লুকিয়ে আমি কিছু খাবার নিয়ে গেলাম। অথচ একই সেন্টারে থাকি, আমি কিন্তু অন্য কমরেডের ছেলেকে দিলাম না। আমার ছেলেকে বললাম, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে ফেল, কেউ দেখে ফেলবে। এই যে ছোট ছোট সংকীর্ণতাগুলো, এগুলো থাকলে তো কমিউনিস্ট হতে পারবে না। ওগুলো লুকানো থাকতে পারে না, ধরা পড়বেই। ধরা পড়ার মানেই হল, আমি তাকে বলব যে, কমরেড এ তো শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নয়। কখনও দেখা যায়, একজন কমরেড, যে বন্দুকের গুলির মুখে দাঁড়ায়, সেও কিন্তু কখনও এই সব ত্রুটির শিকার হয়। সন্তানের প্রতি দুর্বল হয়ে, স্ত্রীর প্রতি দুর্বল হয়ে, স্বামীর প্রতি দুর্বল হয়ে এ সব করে। তাদেরকেও এই লড়াইয়ের মধ্যে আনতে হবে। যেখানে নেতা-কর্মী একত্রে থাকবে, সেখানে কর্মীও নেতাকে ত্রুটি দেখলে বলবে, আপনার এ কাজটা অন্যায়। আপনি এটা করতে পারেন না। তারা পৈলান সাহেবকে বলবে, আমাকে বলবে। সেই শিক্ষা ও সাহস দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। নেতাদের প্রতি বলেছেন, আমাদের মন দিয়ে শুনতে হবে কেন কর্মীরা এ কথা বলছে। বলছেন সন্তান পিতাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। নেতাদের তার মর্যাদা দিতে হবে, কর্মীরা ঠিক বললে মানব, ভুল বললে প্রয়োজনে বিশ-ত্রিশ বার তাকে শান্ত হয়ে বুঝিয়ে বলব। এই সব খোলামেলা আলোচনার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কিছু নেতা থাকে যাদের সাথে কর্মীরা মন খুলে কথা বলতে পারে না। কর্মীদের মনের মধ্যে কথা থাকে। দরজার কাছে হাঁটাহাঁটি করে, বলব-বলব ভাবে, ঢোঁক গিলতে থাকে, মাথা চুলকাতে থাকে, আবার ভাবে, আচ্ছা থাক আজকে। এগুলি কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নয়। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে তর্ক করতে শিখেছি বাচ্চা বয়সেই, হাফ-প্যান্ট পরা বয়সেই, তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন। আবার আমাদের দলে এমন নেতাও আছেন, যারা কর্মীদের বলতে দেয় না, ধমকায়, কণ্ঠরোধ করে। তাঁরা কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী চলেন না। তাঁরা অন্য ক্ষেত্রে ভালো কাজ করলেও এখানে তাঁরা পুঁজিবাদী রক্ত বহন করছেন। এগুলো পরিষ্কার হয় সেন্টারে থাকলে। ফলে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করার জন্য সেন্টার লাইফ, যেখানে থাকার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে শুধু মুক্ত হওয়া নয়, স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসা এ সব প্রশ্নেও বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত যে মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা-আচার-আচরণ তার থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম চলে। এই সংগ্রাম গাইড করার মতো উপযুক্ত নেতাও চাই। যাকে অবশ্যই ইমপার্সোনাল হওয়ার সংগ্রামে অগ্রণী হতে হবে। এই সব সংগ্রাম যাতে আমরা ঠিকমতো করতে পারি, তার জন্যই কিন্তু এই পার্টি সেন্টার। আশা করি আপনারা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে এই সেন্টারকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

এস ইউ সি আই (সি)-র বিশেষ পার্টি কংগ্রেস সফল করুন

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে কেবলমাত্র এ দেশের নয়, গোটা বিশ্বের খেটে খাওয়া মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে যে দীর্ঘস্থায়ী আপসহীন সংগ্রামে নিয়োজিত তা এদেশের মানুষ জানেন। আমাদের বিশ্বাস, সাধারণ মানুষ নিশ্চয় এটাও লক্ষ করেছেন যে, এই সংগ্রাম করতে করতেই তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সারা জীবনের সংগ্রামের সাথী তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর পরিচালনায় ১১-১৭ নভেম্বর, ২০০৯ দিল্লিতে দলের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে কমরেড নীহার মুখার্জী, যিনি দ্বিতীয় কংগ্রেসেও দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং দলের সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে দলের বিশেষ কংগ্রেস কলকাতার মহাজাতি সদন হলে আগামী ২৪-২৫ নভেম্বর, অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

এই কংগ্রেস, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করবে এবং তার মধ্য দিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জরুরি প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করবে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পরে পরেই, আমরা লক্ষ করছি, যুদ্ধোন্মাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ আগের চাইতে আরও ভয়ংকরভাবে দেশে দেশে, বিশেষ করে দুর্বলতর দেশগুলির মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ শানাচ্ছে এবং তার সঙ্গে বিশ্বায়নের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ নিপীড়নও চালাচ্ছে। ইরাক, আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন, ইরান, সমাজতান্ত্রিক কিউবা ও উত্তর কোরিয়া, সুদান সহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিই এমন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও সামরিক নিপীড়নের জঘন্যতম শিকারে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে নজিরবিহীন অর্থনৈতিক মন্দার থেকে মানুষের কোনও স্বস্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদীদের এই ঔদ্ধত্য ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বের দিকে দিকে নানাভাবে মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠছে।

মানবতার উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের এই বিরামহীন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দীর্ঘদিন ধরে দেশে দেশে গণতন্ত্রপ্রেমী ও মুক্তিকামী জনসাধারণকে সংগঠিত করে আন্তর্জাতিক স্তরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। দলের এই রাজনৈতিক লাইন গত দ্বিতীয় কংগ্রেসে সমর্থিত হয়েছে ও তাকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই অবস্থাই এখনও চলছে শুধু তাই নয়, বরং গত কয়েক মাসে আরও অবনতি হওয়ায় আসন্ন বিশেষ কংগ্রেস এই বিষয়ে আরও একবার গভীরভাবে আলোচনা করে কী কী বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হবে। বিভিন্ন দেশের নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তাকে আরও বিস্তৃত করে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন হিসাবে সংগঠিত করা যায়, যার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে যতদূর সম্ভব সত্যিকারের কমিউনিস্টরা কাজ করবে, এই বিশেষ কংগ্রেস সে ব্যাপারেও আলোচনা করবে। এই আলোচনাকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর জন্য এই বিশেষ কংগ্রেস বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সম্পর্ক, সংযোগ ও ঐক্য গড়ে তোলার পথনির্দেশ করবে।

জাতীয় পরিস্থিতির নানা দিক সম্পর্কে মূল্যায়ন করে দ্বিতীয় কংগ্রেস জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে উচ্চ নীতিনৈতিকতার ভিত্তিতে সাংগঠনিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে গোটা দেশের যেখানেই সম্ভব আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেস পরবর্তী মাসগুলোতে জনজীবনের উক্ত সমস্যাগুলি, বিশেষ করে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, তীব্র বেকার সমস্যা, উন্নয়নের নামে কৃষকদের জীবন ও জীবিকা থেকে উৎখাত করে নির্লজ্জভাবে কৃষিজমি লুণ্ঠন করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের আরও বঞ্চনার দিকে ঠেলে দেওয়া প্রভৃতি সমস্যাগুলি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস যে রাজনৈতিক লাইনকে তুলে ধরেছিল তার ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন অংশের খেটেখাওয়া মানুষকে যুক্ত করে উচ্চ নীতিনৈতিকতার ভিত্তিতে দেশব্যাপী আরও শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন কীভাবে গড়ে তোলা যায় এই বিশেষ কংগ্রেস তার পথনির্দেশ করবে। সাথে সাথে এই কংগ্রেস শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ও তার সেবাদাস দলগুলোর মদতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে জাত-পাত-সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তার বিরুদ্ধে কীভাবে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় তারও চেষ্টা করবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই বিশেষ কংগ্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অতীতের মতো তাদের সর্বশক্তি দিয়ে নৈতিক, আর্থিক ও অন্যান্য সকল প্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করছে।

মার্কিন থাবার নিচে ইরাক

সাতের পাতার পর

ল্যাঞ্জা, যিনি ইউ এস মিলিটারির স্পোকসম্যান, জানাচ্ছেন, ''এখনই কোনও কিছুর পরিবর্তন হবে না। আমরা এখন শুধু স্থিতিশীলতা বজায় রাখার দিকে লক্ষ রাখছি। জেনারেল রে ওডিয়ের্নো, যিনি ইরাকে অবস্থিত মার্কিন সেনার উচ্চপর্যায়ের একজন কমান্ডার, সি বি এস টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন, 'ইরাক যদি তাদের দীর্ঘদিন সাহায্যের জন্য রেখে দিতে চায়, তবে সেই আহ্বানে তাদের তো সাড়া দিতেই হবে।''

হিংস্র চতুষ্পদ যেমন তার শিকার কামড়ে ধরে খুবলে খুবলে খায়, তেমনি আমেরিকা ইরাককে খেয়েছে। পরে তার শকুনি দৃষ্টি পড়েছে উত্তর কোরিয়া, ইরান এবং আফগানিস্তানের দিকে। খুবলে খুবলে খাওয়ার মতো গোটা ইরাককে গর্তের দেশ, ধ্বংসস্তূপের দেশ বানিয়ে দিয়েছে। মুছে দিয়েছে ইরাকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সম্পদ সমূহ। সেই ইরাক, যে সভ্যতাকে প্রথম লিপির ব্যবহার শিখিয়েছে, সেই ইরাক, যে প্রথম ওজন মাপার জন্য বাটখারার ব্যবহার শিখিয়েছে, সেই পৃথিবী প্রসিদ্ধ হামুরাবির দেশ, পারস্য উপসাগরের উত্তরে টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী সমভূমি কমপক্ষে ছয় হাজার বছর আগের তাম্র-ব্রোঞ্জ সভ্যতার সেই মেসোপটেমিয়া আজ হিংস্র ক্ষুধার্ত সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার থাবায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ইরাক, যার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি আজ আর নেই। লুঠ হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে, জঞ্জাল হয়ে গেছে। রাজা নেবুকাডনেজারের উল্লেখযোগ্য কীর্তি পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান আজ এক ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ২০০৩-এর ইরাক অভিযানে সেটাই ছিল মার্কিন সেনার ঘাঁটি। এক লক্ষ সত্তর হাজার ঐতিহাসিক নিদর্শন আজ ইরাক থেকে বেপাত্তা। লুঠ হয়ে গেছে দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিখ্যাত জাতীয় সংগ্রহশালা, লুঠ হয়ে গেছে সমস্ত সরকারি ভবন। বহুবার মার্কিন বিমান বন্দরে উদ্ধার হয়েছে বহু চোরাই দুর্মূল্য প্রত্নসামগ্রী-শিল্পকর্ম। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন প্রশাসন ব্যান্ড বাজিয়ে লোক জানিয়ে কিছু প্রত্নসামগ্রী ইরাকের হাতে তুলে দিয়েছে। ব্যাবিলন পুনর্গঠন এবং সংরক্ষণের জন্য এগারো লক্ষ ডলার দিয়েছে। ইরাকের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য ৯ কোটি ১৩ লক্ষ মার্কিন ডলার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু প্রশ্ন তো থেকেই যায়, ইতিহাস পুনর্গঠন করা যায় কি? যদিও বিশ্বদাদা সে সব কোনও কিছুরই ধার ধারে না। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে ১৯৫৪ সালের হেগ কনভেনশন অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধ মামলায় জর্জরিত করে দেওয়া উচিত।

ইউনেস্কোর হইচই, আন্তর্জাতিক মিডিয়ার চাপ, সারা বিশ্বের ধিক্কার, এ সব কিছুই নানা কৌশলে ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টায় আছে সে। সে তার রুমাল দিয়ে অন্য আর একটি বিষয়ও চাপা দিয়ে রেখেছে। যা হল ইরাকের তেল। তার লোলুপ দৃষ্টি তাকেও হস্তগত করে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। আন্তর্জাতিক বাজারে ইরাকি তেলের সরবরাহে নিজস্ব আধিপত্য বিস্তার করে বিশ্বপ্রভুত্ব জোরদার করতে চায় এবং তার বিশ্বরাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী চিনকেও কোণঠাসা করতে চায়। কারণ ২০০৩ সালের আগে থেকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে চিনে তেল সরবরাহ অব্যাহত আছে।

নানা ভাবে ঘুঁটি চেলে, ইরাকের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে উস্কে দিয়ে এবং কিছুদিন পরপর অস্থায়ী পুতুল সরকার রাজের ক্ষেত্র বানিয়ে আধিপত্য বিস্তারে লিপ্ত থাকতে চায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ফলে ইরাক জুড়ে মুক্ত হওয়া সহজ বিষয় নয়। সমগ্র ইরাক দলমত, জাত্যাভিমান ইত্যাদি সবকিছুকে দূরে ঠেলে একজোট হয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে না তুললে এবং বিশ্বজোড়া তীব্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে না উঠলে মার্কিন আগ্রাসন থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন।

৮ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার ভারত সফরের প্রতিবাদে আসামের গৌহাটিতে ওবামার কুশপুতুল পোড়ানো হচ্ছে ও নিচে গুজরাটের আমেদাবাদে বিক্ষোভ মিছিল

এস ইউ সি আই (সি)-র বিশেষ পার্টি কংগ্রেস সফল করুন

২৪-২৫ নভেম্বর, মহাজাতি সদন, কলকাতা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in